ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386


# স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ।। ৩০ ফাল্গুন, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৫ মার্চ, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com


মুসলিম সংরক্ষণ

## সামাজিক বিভাজনেরই অন্য নাম

প্রীতিমাধব রায়।। সংবিধানের স্বরূপ হলো মূলনীতি। সাধারণ আইনের সঙ্গে একটু ভোটের কড়াকড়ি যোগ করলেই তা সংবিধান হয়ে যায় না। সংবিধানের ভিত্তি হলো মূল্যবোধ ও ন্যায্যতা। এই জন্যই সংবিধানকে এক পবিত্র সামগ্রী বলে মনে করা হয়, ক্ষমতার আসনে বসতে হলে সংবিধানের নামে শপথ গ্রহণ করতে হয়।

এইদিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় সংবিধান আয়তনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংবিধান হলেও নীতি ও প্রয়োগের দিক থেকে ব্যর্থ। কিছু কিছু কাজ আছে, তা সর্বকালে, সর্বদেশে অন্যায়, যেমন, পিতামাতাকে হত্যা করা,

সোজা-সাপ্টা

এমনকী উপেক্ষা বা অসম্মান করা সবসময়েই অন্যায়। প্রাচীন ভারতের তৈত্তিরীয় উপনিষদের যুগেও অন্যায়, আধুনিক মার্কিন দেশের মূল্যবোধ ও আইনকানুনেও অন্যায়। জনপ্রতিনিধি সভায় শতকরা ১০০ ভাগ ভোটে পাশ করিয়ে আনলেও ওই কাজ কখনও ন্যায় হবে না। কিন্তু, ভারতবর্ষে ভোটের জোরে সংবিধান সংশোধন করে বহু অন্যায়কেই ন্যায় বলে দেখান হয়েছে। শাহবানু মামলা থেকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর পর্যন্ত বহুক্ষেত্রেই সংবিধান ব্যবহার করে এই অন্যায় চালু করা হয়েছে। এর জন্য সংবিধান কিছুটা দায়ী হলেও, অধিকাংশ দায় হলো পার্টি নামক প্রয়োগ কর্তাদের।

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান রূপকার ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর জাতিতে ছিলেন তথাকথিত নিম্নবর্ণের বা তপশীলভুক্ত জাতির মানুষ। তাঁর রচিত প্রাথমিক সংবিধানে যখন তিনি তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন, তখনও তিনি তা স্থায়ীভাবে করেননি, করেছিলেন মাত্র দশ বৎসরের জন্য। কারণ, তিনি ফরাসী সংবিধানের অনুকরণে সংবিধানের মুখবন্ধেই 'সমতা'র সুযোগ রেখেছিলেন। আর তাঁর এটাও মনে ছিল যে, সমস্ত রকম সংরক্ষণই মূলত সংবিধানের ইচ্ছার বিরোধী। নিজে তপশীলভুক্ত জাতির লোক হয়েও তিনি তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা মাত্র দশ বৎসরের জন্য রেখেছিলেন এই ভাবনা নিয়ে যে, এই

(এরপর ৪ পাতায়)

## মূল্যবৃদ্ধি রোধে উদাসীন রাজনৈতিক দলগুলি

।। গূঢ়পুরুষ।। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে একমাত্র বিজেপি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক দলের গণ আন্দোলনে নামার সদিচ্ছা নেই। যেমন, লালু-মুলায়মরা সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল রুখতে যতটা তৎপর তার দশ শতাংশ তৎপরতা মূল্যবৃদ্ধিরোধে দেখাচ্ছেন না। বামদলগুলি বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম তৃণমূলকে ঠেকাতে নানা কৌশল রচনায় ব্যস্ত। তা ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং খাদ্য নিয়ে কালোবাজারীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরও। সব দোষ কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে পার পাওয়া যায় না। তবে রাজনৈতিকভাবে মূল্যবৃদ্ধিরোধে সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় আছে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতায় তৃণমূল নেত্রী মূল্যবৃদ্ধিরোধে গণ আন্দোলনের হুমকি দেন। দিল্লীতে নেত্রী রেলের উপর পরিষেবা কর তুলে নিলে আন্দোলন না করার প্রতিশ্রুতি দেন। অনেকটা মাছের বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার দরদাম করার মতো।

বিজেপি গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই দেশজুড়ে গণ আন্দোলনে পথে নেমেছে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে সারা পূর্বভারতের রাজ্যগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলন হয়েছে। অসমের গুয়াহাটিতে প্রায় ৩০,০০০ মহিলা রাজপথে মিছিল করেছেন। একই প্রতিবাদী গণ মিছিল হয়েছে মণিপুর ও শিলং শহরে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ জেলায় জেলায় প্রতিদিন বিজেপি-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল চলছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কলকাতার সংবাদমাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের খবর নেই। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংবাদপত্র এবং টিভি সংবাদ চ্যানেলের টিকি ক্ষমতাসীন কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে বাঁধা আছে। এক কথায়, এই রাজ্যের সংবাদমাধ্যম সিপিএম অথবা তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের তল্পিবাহক। দালালও বলতে পারা যায়। যাঁরা টিভিতে খবর দেখেন এবং শোনেন অথবা দৈনিকপত্রে খবর পড়েন, আশাকরি তাঁরা এ কথাটি জানেন ও বোঝেন। পশ্চিমবঙ্গে এখন একটিও জাতীয়তাবাদী নিরপেক্ষ দৈনিক সংবাদপত্র নেই। তাই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের খবর ছাপা হয় না। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকলে এবং তাদের নেতা-নেত্রীদের ঢাক পেটালে আখেরে আর্থিক লাভ হয় সংবাদপত্র পরিচালকদের এবং

(এরপর ৪ পাতায়)

## মাওবাদীরা যোগ দিচ্ছে সিপিএমে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গণভিত্তি কমছে মাওবাদীদের। আর তা নিয়েই ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে সিপিএম। মাও গণভিত্তি কমার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ, শিলদা কাণ্ডের পরদিন লালগড়ের শ্যামপুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন কিষেণজী। তারপরেই সেখানে থেকে নিপাত্তা হয়ে যান তিনি। ইতিমধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়েন কিষেণজীর সহকারী তেলেগু দীপক। বুদ্ধিজীবী মহলের একটা পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছিল, অত্যাচারিত জনজাতি সমাজের ওপর থেকে ফোকাস সরাতেই তেলেগু দীপককে গ্রেপ্তার করিয়েছে সিপিএমের সরকার। আপাতত পরবর্তী কয়েকদিন তেলেগু দীপকের ওপর ফোকাস করেই মাও-সমস্যা দূরীকরণে তাদের সাফল্যটাকে প্রচার-মাধ্যমের আলোকে নিয়ে আসতে চাইছিল সিপিএম। আর এটা করতে গিয়েই আলিমুদ্দিনে রাজ্যপার্টির তরফ থেকে তাদের ক্যাডারদের 'নতুন নক্‌শাল রিক্রুটমেন্টে'র ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সি পি এম নেতাদের এই 'সতর্কবার্তায়' রাজ্যের তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে—মাওবাদী ও মার্কসবাদীদের মধ্যে গোপন আঁতাতের যে গন্ধটা প্রথম থেকেই নাকে আসছিল, তার সত্যতা অনেকটাই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে এর মাধ্যমে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ব্যাখ্যা, বিরোধীদের একেবারে নিকেশ করার জন্য

মাওবাদীদের সঙ্গে একপ্রকার পারস্পরিক বোঝাপড়া করেই এগোচ্ছিল সিপিএম। যে কারণে কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চাপ থাকা সত্ত্বেও এরাজ্যে মাওবাদীদের নিষিদ্ধ করেনি বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্রিয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশবাহিনীকে লালগড়ে পাঠানো হয়েছিল স্রেফ সিপিএমের নেতা-কর্মীদের 'পাহারা' দিতে। কারণ 'আখের গুছনো' সেই সমস্ত পার্টিকর্মীদের ওপর যে-কোনও মুহূর্তে জনরোষের ঢেউ আছড়ে পড়ার একটা আশঙ্কা ছিলই। শিলদা'র ঘটনার পরেই এই অনুমান অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং মাও-মার্কসের চ্যালাদের 'গট-আপ' গেমের একটা আভাস ক্রমেই জনসমক্ষে উন্মোচিত হচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে মাওবাদীরা গাড্ডায় পড়ায় উত্তর চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান ও বীরভূমে অনেক মাও-ক্যাডার সিপিএম দলে যোগ দিতে চাইছেন বলে আলিমুদ্দিন পার্টি

(এরপর ৪ পাতায়)

নয়া মোড়ক : 'দ্য হিন্দুস অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি'

## হিন্দুত্বকে অপমানের সেই ট্রাডিশান সমানে চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ওয়েনডি ডোনিজারের বই 'দ্য হিন্দুস ঃ অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি'-কে নিষিদ্ধ করতে বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হলো। এবং বলা বাহুল্য এই প্রচারাভিযানটিকে (ক্যাম্পেন) বিশ্বব্যাপী করার প্রয়াস ইন্টারনেটের অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমেই সাধিত হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে যে ডোনিজারের বইটির প্রকাশককে সর্বজনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ প্রকাশনাটি 'অসত্য তথ্য-সমৃদ্ধ ও হিন্দুদের মর্মাহত' করার পক্ষে যথেষ্ট। অভিযোগকারীরা বলছেন—"ঐতিহাসিক সত্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিকৃত করা হয়েছে 'দ্য হিন্দুস ঃ অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি' পুস্তকটিতে। এই সমস্ত ভ্রান্তি এবং অসৎ উপস্থাপনা ভারতীয় ও হিন্দু ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল পথে চালনা করবে।" তাঁরা দাবি করছেন—"ফ্রয়েডের (বামপন্থী দার্শনিক) মনোযৌনগত (সাইকো-সেক্সুয়াল) তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ডোনিজার হিন্দু দেব-দেবীদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অপব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের মধ্যে আধুনিক ও মানবিক মনোবিজ্ঞানের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব্যাখ্যা যেমন কোনও সত্য উদ্ঘাটন তো করতে পারেইনি,

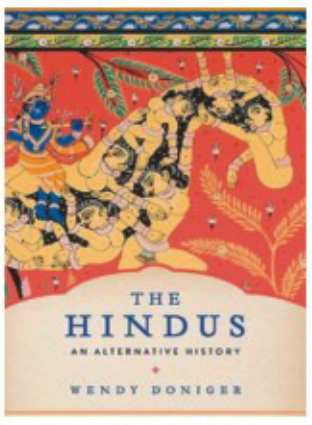


উপরন্তু হিন্দু-দর্শনকে বিপথগামী করবার চেষ্টা চালিয়েছে।' অভিযোগকারীরা মনে করছেন 'নিজের কোলে ঝোল টেনে' ডোনিজার অনেক বিষয়েই ভ্রান্ত 'অনুমান' করেছেন। তাঁর এহেন প্রচেষ্টায় যেভাবে হিন্দু-দর্শন, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের বিকৃতি হয়েছে, অনুসন্ধিৎসু হিন্দু-পাঠকের তাতে যে বেশ বড়সড় আঘাত লাগবে, এমনটাই মনে করছেন ডোনিজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ-দাখিলকারীরা।

আসলে ডোনিজার তাঁর বইটিতে 'স্বতঃপ্রণোদিত' ভাবে হিন্দু দর্শনের সঙ্গে অকারণ যৌনতা-কে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই কারণে ঋক্‌বেদের মতো শাস্ত্রে ডোনিজারের 'মানস-নেত্রে' এক মহিলার উদয় ঘটেছে, যিনি কিনা তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সহবাস করতে চেয়েছেন! অভিযোগকারীরা বলছেন, "ঋক্‌বেদের কোন অংশে এহেন ঘটনার উল্লেখ আছে, সেকথা ডোনিজার তাঁর বইতে লেখেননি। শুধুমাত্র হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে যৌনতা আনতে তিনি এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন।" বরঞ্চ ঋকবেদে যে সাম্যের কথা বলা হয়েছে, ঈশ্বর যে সর্বত্র বর্তমান, অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করার যে মহৎ আদর্শের কথা বলা রয়েছে তা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন ওয়েনডি ডোনিজার। এমনই দাবি ইন্টারনেটের অনলাইনে। এমনকী 'দ্য হিন্দুস ঃ অ্যান অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি' বইটিতে রামচন্দ্রকে প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখানো হয়েছে। পিতা দশরথের আদেশে তিনি যখন স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে রওনা হন তখন সর্বজনমান্য লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রীতির পরাকাষ্ঠা হিসেবে লক্ষ্মণের মুখে অসম্ভব একটা কথা বসিয়েছেন ডোনিজার। বাল্মিকীর রামায়ণটা আদ্যপান্ত পড়ে ফেললেও যার ন্যূনতম হদিশ মেলা ভার। ডোনিজার বর্ণিত লক্ষ্মণ দশরথ সম্বন্ধে বলেছেন—"তিনি অপদার্থ, বৃদ্ধ ও কামাসক্ত। কামের তাড়নাতেই রামকে বনবাসে পাঠিয়েছেন দশরথ।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটা স্বাভাবিক

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

# ভবিষ্যত প্রজন্মের সঞ্জীবনী বীর সাভারকর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সৃষ্টিকে রক্ষার জন্য বিষপান করে যিনি নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, তিনি জগৎপূজ্য। আর যিনি স্বদেশ ও সমাজের জন্য আজীবন অশেষ কষ্ট ও অত্যাচার এবং মৃত্যুর পরও উপেক্ষা ভোগ করেছেন, সেই স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের জন্য কেউ কিছু করছেন না কেন? এই প্রশ্নটাই শ্রোতাদের সামনে রাখলেন খ্যাতনামা সাভারকর গবেষক ডঃ হরীন্দ্র শ্রীবাস্তব। গত ৭ মার্চ সকালে কলকাতায় মহাজাতি সদনে আয়োজিত সাভারকরের ডায়েরী 'সিংহ গর্জনা' নামে গ্রন্থটির উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। ডঃ শ্রীবাস্তব বহু পরিশ্রম করে এই গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন। গ্রন্থটিতে স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাষণ, ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম এবং বেশ কিছু দুর্লভ চিত্র রয়েছে।

*(এরপর ১৩ পাতায়)*

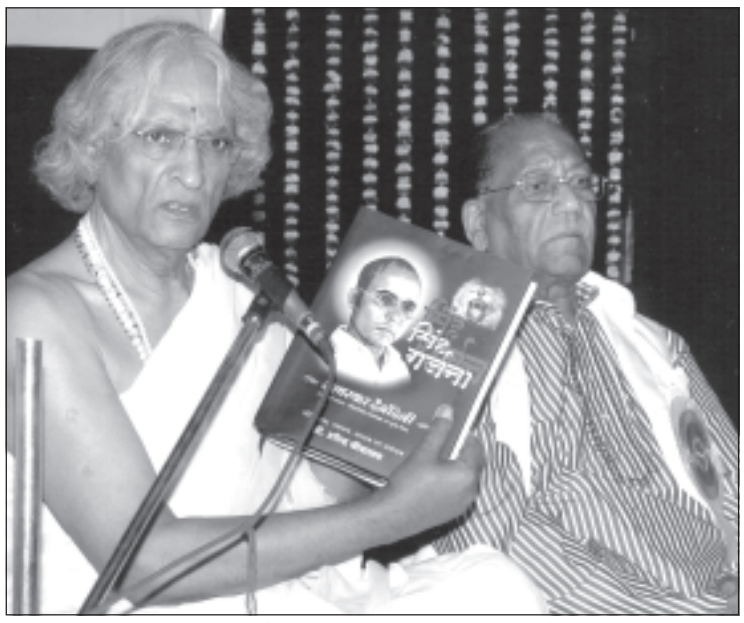

*'সিংহ গর্জনা' গ্রন্থের উন্মোচন করছেন ধর্মেন্দ্রজী।*

*বক্তব্য রাখছেন ডঃ হরীন্দ্র শ্রীবাস্তব।*

## এই সময়

### গৃহযুদ্ধে মস্তিষ্ক বিকৃতি

লাগাতার গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত পাক সরকারের যে মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ গত ৮ মার্চে লাহোর বিস্ফোরণের পর পাক-প্রশাসন এর দায় চাপিয়েছে ভারতের ঘাড়ে। পাক্ গৃহমন্ত্রী রেহমান মালিক এই ঘটনায় 'র'(ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দাবাহিনী)-এর 'হাত' দেখতে পেয়েছেন। অথচ লাহোর হামলার যাবতীয় দায় আগেই স্বীকার করেছে তালিবানী গোষ্ঠী। জঙ্গিকুলের নিকট জনপ্রিয়তার নিরীখে নিজেদের সেনা-বাহিনীর কাছে হেরে পাকিস্তান সরকারের এই মস্তিষ্ক-বিকৃতমার্কা মন্তব্য; বলছেন কূটনীতিকরা।

### বজ্র আঁটুনি

নিরাপত্তা বাড়ছে বিচারপতি কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর এবং বিচারপতি অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ২০০০ সালে কলকাতায় মার্কিন সেন্টারে হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আফতাব আনসারির ফাঁসির আদেশ বহাল রাখেন গত ৫ ফেব্রুয়ারি। তারপরেই আফতাবের সাঙ্গোপাঙ্গদের তরফ থেকে মৃত্যু-হুমকি দেওয়া হয় কালিদাসবাবুকে। এই হুমকির বেশ কিছুদিন পরে টনক নড়ল রাজ্য সরকারের। সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যসচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী অবশেষে গত ৬ মার্চ সংশ্লিষ্ট বিচারপতির নিরাপত্তা বৃদ্ধির কথা জানালেন। কিন্তু ঢাল-তলোয়ার হীন নিধিরাম সর্দার মার্কা রাজ্য পুলিশবাহিনীর আঁটুনি বজ্র হলেও, গেরো ফস্কা নয়তো? এই প্রশ্নটা উঠছে অনিবার্যভাবেই।

### (স্বাস্থ্য)বিধি বাম

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যপ্রতিমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী মশাই-এর বড় সাধ ছিল এশিয়ার প্রাচীনতম স্বাস্থ্যকেন্দ্র কলকাতা মেডিকেল কলেজকে দিল্লীর অল্ ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ মেডিকেল সায়েন্স (এইমস্)-এর পর্যায়ে উন্নীত করবার। সে কারণে কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদকে সঙ্গে করে গত ৬ মার্চ মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে আসেন তিনি। সাথে ছিলেন এরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। তবে পরিদর্শনে গিয়ে গুলাম যা দেখলেন তাতে তাঁরই এখন শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন হবে বলে বোধ হচ্ছে। প্রথমত, সেখানে এত বেশি ব্লিচিং পাউডার ঢালা হয়েছিল যে তার গন্ধে টেকাই দায় হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, ওই কলেজের প্রায় তিনশ কর্মীর বিক্ষোভ প্রদর্শন (যাঁদের লক্ষ্য মূলত সূর্যকান্ত)। সুস্থ হয়ে গুলাম মেডিকেল কলেজকে এইমস-এর মর্যাদা না দিয়ে মেছুয়াপট্টী (কলকাতার ঘিঞ্জি বাজার)-র মর্যাদা না দিয়ে বসেন।

### স্থগিত মেডিকেল মিশন

ভারতীয় মেডিকেল মিশন কাবুলে তাঁদের যাবতীয় কার্যকলাপ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি জঙ্গিহানায় তাঁদের টীমের এক ডাক্তার মারা যান ও একজন স্বাস্থ্যকর্মী আহত হন। যদিও ভারতীয় মেডিকেল মিশন আফগানিস্তানের অন্যত্র যেমন কান্দাহার, জালালাবাদ, হিরাট ও মাজার-ই শরিফে আগের মতোই কাজ করছে। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে—কঠিন পরিস্থিতিতে তীব্র চাহিদার মুখে একমাত্র কাবুলে মেডিকেল মিশন বাদ দিলে ভারতীয় দূতাবাস ও কার্যালয়গুলো ঠিক আগের মতোই কাজ করছে। জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে যে ভারতবাসীরা মরুভূমির ন্যায় ভূখণ্ডের মাঝে আর্তের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তাঁদের প্রতি কি আরও একটু কর্তব্যসচেতন হতে পারত না আফগান-সরকার?

### অশনি-সংকেত

আধুনিক বিশ্বায়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ইঁদুর দৌড়ের রাস্তায় এবার সামিল হলো ভারতীয় পাসপোর্টও। কেন্দ্রিয় বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণা সম্প্রতি জানিয়েছেন ভারত কিছুদিনের মধ্যেই ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করবে। যার ফলে হাজার টাকার বিনিময়ে অনন্তকাল অপেক্ষা বা জরুরি পাসপোর্টের জন্য অধিক পরিমাণ টাকা আপনাকে আর দিতে হবে না। দিনতিনেক অপেক্ষমান হলেই আপনার হাতে এসে যাবে ই-পাসপোর্ট। কিন্তু বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া এই পাসপোর্ট, সন্ত্রাসবাদীদের কাছে প্রচুর পরিমাণে চলে আসার একটা সম্ভাবনা কোনওভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং অশনি-সংকেত থাকছেই ই-পাসপোর্টে।

### ঘুরপথে বিলগ্নীকরণ

সামনে ভোট নেই বুঝে পুরোদস্তুর আর্থিক সংস্কারের পথে এগোচ্ছে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার। যার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন চলতি অধিবেশনে তাঁরা একটি সংশোধনী বিল আনতে চাইছেন। যেখানে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কে তাঁদের নির্ধারিত সীমা (স্টেক) ৫৯.৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫১ শতাংশ করা যাবে। অর্থমন্ত্রকের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, এর ফলে স্টেট ব্যাঙ্ক তাদের তহবিল বাড়াতে সক্ষম হবে ফলো-অন-পাবলিক অফার (এফ পি ও) কর্মসূচীর মাধ্যমে। বর্তমানে এর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ২০৪০ কোটি টাকা। এই হিসেবে শেয়ার বেচে অন্তত ২০,০০০ কোটি নগদ টাকা হাতে আসার কথা ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের।

### টার্গেট কলকাতা

কেন্দ্রিয় গৃহ-মন্ত্রক তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে কলকাতা, মুম্বাই ও ব্যাঙ্গালোর শহরের ওপর বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। তাদের এহেন বিশেষ সতর্কতা জারি করার কারণ জঙ্গি গোষ্ঠী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর টার্গেটে (পড়ুন কু-নজর) রয়েছে এই মেট্রো শহর তিনটি। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গি সলমন আহমেদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা। সলমন জেরায় স্বীকার করেছেন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন তাদের 'করাচি পরিকল্পনা' মাফিক কাঠমাণ্ডু, দুবাই এবং পশ্চিম এশীয় দেশগুলোতে ঘাঁটি গেড়েছে। সলমন স্পষ্টই বলছেন, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের এখন এক এবং একমাত্র লক্ষ্য ভারতের মেট্রো-শহরগুলির ওপর জঙ্গি-নাশকতা চালানো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## মহিলা সংরক্ষণ বিল—প্রথম পর্ব

একেই বলে ব্যুমেরাং। বাজেটকে কেন্দ্র করিয়া বিরোধী দলগুলির মধ্যে যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, মহিলা বিলকে কেন্দ্র করিয়া সেই জোটকে ছিন্নভিন্ন করিবার মতলব ভাঁজিয়া ছিলেন সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস। কিন্তু সেই মতলব হাসিল তো দূর অস্ত, আখেরে কংগ্রেস ও মনমোহন সিং সরকারকে চরম ল্যাজে-গোবরে হইতে হইল।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে ইতিহাস রচিত হউক—এই ভাবনাকে সামনে রাখিয়াই গত ৮ মার্চ রাজ্যসভায় অনুমোদনের নিমিত্ত পেশ করা হয় মহিলা বিল। দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সুনিশ্চিত করাই হইল এই বিলের লক্ষ্য। আর জে ডি, এস পি-র বিরোধিতার কথা জানিয়াও সরকার পক্ষকে এই বিলটি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়াছিল বিজেপি ও বামপন্থীসহ বেশ কয়েকটি বিরোধী দল। এই বিল পাশ হইবার ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার এতটাই নিশ্চিত ছিল যে তাহারা কোনও 'রোড ম্যাপ'-ই তৈয়ারী করে নাই। বস্তুত বিজেপি ভোটাভুটির জন্য হুইপ জারি করিবার পর কংগ্রেস সেই পথই অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। ফলে সরকারের ভূমিকা লইয়াই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। পরিণতিতে ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়া গেল। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারিকে হেনস্তা হইতে হইল সাংসদদের হাতে। ইতিহাস তো হইলই না, বরং আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আরও একবার প্রতারিত হইলেন নারীরাই।

লালু-মুলায়মের দল এই বিলের মধ্যে মুসলিম ও অনগ্রসর শ্রেণীদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ চাহিয়াছিল। অর্থাৎ সংরক্ষণের মধ্যে সংরক্ষণ। কংগ্রেস ও সরকারের সহিত দফায় দফায় বৈঠক ও অনুরোধ সত্ত্বেও লালু-মুলায়ম অনড়ই থাকিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁহাদের দলের সাংসদদের মার্শাল দিয়া সভা হইতে বহিস্কার করা হইল। লালু-মুলায়ম ইতিমধ্যে ইউপিএ সরকার হইতে সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি তো দিয়াই রাখিয়াছিল, এখন সেই ক্ষোভাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। আসলে এই বিলকে কেন্দ্র করিয়া লালু-মুলায়ম আবার নিজেদের ভিত শক্ত করিবার সুযোগ হাতে পাইয়াছে। একদিকে নিজের নিজের রাজ্যে এই দুই নেতা নিজেদের 'যাদব ব্র্যাণ্ড'-কে আবার পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, একইভাবে নিজেদের মুসলিম ও অনগ্রসর শ্রেণীর নেতা হিসাবে তুলিয়া ধরিতে চাহিতেছেন।

লালু-মুলায়মের সঙ্গে সম্পর্কের এই অবনতি কংগ্রেসের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ। কেননা লোকসভায় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সরু সুতোয় ঝুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। বিশেষত আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে সংসদে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পাশ না করাইতে পারিলে দেশে বেনজির সংকট দেখা দিতে পারে। ইহার উপর লালু-মুলায়ম জোট যেভাবে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ককে উস্কাইতেছেন, তাহাতেও কংগ্রেস উদ্বেগ বোধ করিতেছে। সেক্ষেত্রে লোকসভায় বিলটিকে পাশ করানোর সময় আরও ব্যাপক আকারে গোলমাল হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। কেননা সেখানে লালু-মুলায়ম বাহিনী সংখ্যায় রাজ্যসভা অপেক্ষা অনেকাংশে ভারী। আর লালু-মুলায়মের মতো নেতাদের মার্শাল দিয়া সভাকক্ষ হইতে বহিষ্কার করা কতটা যুক্তিযুক্ত হইবে সেই প্রশ্নও রহিয়া যাইতেছে।

চৌদ্দ বছর অপেক্ষার পর এই বিল রাজ্যসভায় গৃহীত হইল। ভোটাভুটিতে উপস্থিত ১৮৭ জন সাংসদের মধ্যে ১৮৬ জন দলমতনির্বিশেষে মহিলা সংরক্ষণের বিলের পক্ষে রায় দিলেন। এই বিলটি পাশ হওয়ায় দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস রচনার প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল বলা যায়। বিলটি আইনে পরিণত হইতে এখন লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজন। এই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হউক—শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক মাত্রই তাহা চায়। কিন্তু বিলটিকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত যেদিকে মোড় লইতেছে বা ইউপিএ-র মধ্যেই যেভাবে কোন্দল শুরু হইয়া গিয়াছে, তাহাতে লোকসভায় বিলটি আনিতে সরকারপক্ষ আদৌ উদ্যোগী হইবে কিনা সেই ব্যাপারে সংশয় থাকিয়াই যাইতেছে।

### জাতীয়জাগরণেরমন্ত্র

*আমরা কেবল এটাই চাই যে পৃথিবীতে আমাদের পবিত্র ধর্ম এবং সংস্কৃতি যেন তার গৌরবময় স্থান চিরকালের জন্য অধিকার করে। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, তাকে রক্ষা করবার মতো শক্তি যদি আমাদের না থাকে তবে পৃথিবীতে তা কখনই সম্মান লাভ করতে পারবে না। আমরা শক্তিহীন বলেই আমাদের জাতির দীন-হীন দশা। সবকিছু থাকলেও শক্তি ছাড়া চলে না। "জীবো জীবস্য জীবনম"—অর্থাৎ যারা দুর্বল তারা শক্তিমানের ভক্ষ্য—এই হলো পৃথিবীর নিয়ম। পৃথিবীতে দুর্বল ব্যক্তি কখনও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। শক্তিমানের দাসত্ব তাকে করতেই হবে। অপমান ও কষ্ট তার ভাগ্যে লেখা আছে। সুদূর অতীত হতে কেন আমাদের দেশে বিদেশী আক্রমণ চলে আসছে? আমরা দুর্বল ও ঘরনোন্মুখ হয়ে পড়েছি বলেই নয় কি? আমাদের এই দুর্বলতাই আমাদের সমস্ত বিপত্তির মূল কারণ। একে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলতে হবে। যতদিন আমরা দুর্বল থাকব ততদিন স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য শক্তিশালী জাতি আমাদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। তাদের কেবল গালি দিয়ে বা নিন্দা করে কি লাভ? এমন করলেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না। যদি আমরা শক্তিশালী হতাম তবে কেউ কি আমাদের আক্রমণ করতে পারত?*

*—ডাঃ হেডগেওয়ার*

# তথ্য জানার অধিকার কিন্তু তথ্য জানাবে কে?

নবকুমার ভট্টাচার্য

তথ্য জানার অধিকার নিয়ে এখন অনেকে সচেতন হচ্ছেন। কী কী তথ্য জানা যাবে তার তালিকায় ছিল কোনও একটি বিষয়ে সরকারি আমলারা এবং মন্ত্রীরা যে অভিমত লিখবেন ফাইলে, সেটা চাইলে জানা যাবে। এটা পরে সংশোধন করা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে—শেষ সিদ্ধান্ত জানানো হবে। তথ্য জানার আইন অনুসারে কেউ জানতে চাইলে তবে সরকার জানাবে তা নয়;সরকার নিজে থেকেই তার বিভিন্ন দফতরের দেওয়া তথ্য প্রকাশ করবে। প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতেই তথ্য জানার অধিকার। সঠিক তথ্য জেনে একজন নাগরিক সরকারি প্রশাসন ও প্রশাসকের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৩, ১৯৭৫, ১৯৮২, ১৯৮৫ ও ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন মামলার রায়দানে স্পষ্ট করে দেয় যে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) ধারায় ব্যক্তির মতামত প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো তথ্য জানার অধিকার। এমন কী ২১ ধারায় ব্যক্তির বাঁচার অধিকারের সঙ্গেও এটা যুক্ত।

অনেক ভাবনাচিন্তা ও আন্দোলনের পর কেন্দ্রীয় সরকার এই অধিকারকে লিপিবদ্ধ করে ১৫ জুন ২০০5। উক্ত মৌলিক অধিকারটি নাগরিককে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত যত প্রতিষ্ঠান, কমিশন, কমিটি, বোর্ড প্রভৃতির কাছ থেকে তথ্য জানার ক্ষমতা দিয়ে থাকে। এর আওতায় অবশ্যই পড়ে পঞ্চায়েত, বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবহন, ভোগ্য দ্রব্য সরবরাহ প্রভৃতি। একমাত্র ২২টি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা ও রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট সংস্থার তথ্য জানাতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়। জম্মু ও কাশ্মীরের (Ariticle 370) কোনও তথ্য প্রকাশ করার ধারা এই আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে বিলটির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি রোধ করা এবং প্রশাসন ও জনসাধারণের মধ্যে দূরত্ব কমানো। তথ্য বিলে সহজসরল ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি তথ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে তথ্যের জন্যে আবেদন করলে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু যদি ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত তথ্য হয় তবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ তথ্য বিলে রয়েছে। বিলটিকে সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে তথ্য কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। তথ্য কমিশন যদি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ না দর্শিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে অক্ষম হয় অথবা সংবিধানের ৭/২ ধারা অনুযায়ী আবেদন বাতিল না করেন, তাহলে প্রতিদিন ২৫০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ফাইন ধার্য হবে সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে। তার সাথে State Public Information Officers (SP10) এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশন আইন লঙঘন করার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে এবং তথ্য আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও আইনের কিছু ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই আইনের ৬/১ এবং ৬/৩ স্নবঢ ট্টন্তব্ধ-এর মাধ্যমে যে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি ১০ টাকার কোর্ট স্ট্যাম্প অথবা পোস্টাল অর্ডারের বিনিময়ে কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানের (Section 2h, RTI Act) সংশ্লিষ্ট তথ্য আধিকারিকের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সার্টিফায়েড কপি চাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তথ্য আধিকারিকের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে। রাজ্য সরকারের তথ্য আধিকারিকদের নাম ও ঠিকানার জন্য www. rtiwb. gov. in অথবা www. wbic. gov. in এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে www. cic. gov. in ওয়েবসাইট অনুসরণ করতে হবে। আধিকারিকদের নাম ঠিকানা, পদমর্যাদা ইত্যাদি না থাকলে, আইনগত দায়বদ্ধ তার

**কেন্দ্রের অসংখ্য প্রকল্পের টাকা কীভাবে এরাজ্যে নয়ছয় হয় তার হিসাব-নিকাশ প্রকাশ হয়ে যাবে। এই সরকার তাই বোবা এবং কালা। তথ্যের অধিকার আইনও এখানে তাই খাতায় কলমে।**

বোঝা তথ্য কমিশনের উপর বর্তাবে। তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়াটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে তথ্যের জন্য তথ্য- আধিকারিকের ঠিকানায় রেজিস্ট্রি পোস্ট মারফৎ আবেদন করে তিরিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। তথ্য প্রকাশযোগ্য না হলে আধিকারিক ৭/২ ধারা অনুসারে আবেদন বাতিল করে লিখিত উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন। প্রথম পর্যায়ে তথ্য না পাওয়া গেলে প্রথম আবেদনের ফটোকপি সহ দ্বিতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট Appellate Authority কে পুনরায় রেজেস্ট্রি পোস্ট মারফত আবেদন করে ৪৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। কর্তৃপক্ষ ওই আবেদন বাতিল না করলে এবং উত্তর না পেলে এবার সমস্ত আবেদনের ফটোকপি সহ নথিপত্র Chief Information Commissioner (CIC) কে রেজেস্ট্রি মারফত পাঠাতে হবে। তিনি ছহুঙ্গত্র ১৯/৩) (১৯/৮ (স্ত্র) ধারা অনুসারে আবেদন বাতিল করতে পারেন যদি আবেদন গ্রহণযোগ্য না হয়। তথ্য প্রকাশযোগ্য হলে সি আই সি তিরিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে নির্দেশ দিয়ে থাকেন তথ্য প্রকাশ করার জন্য।

বস্তুত তথ্য জানার অধিকার রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ ব্যর্থ। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য রাজ্যের তফাত অনেক। অন্ধপ্রদেশ সরকার তথ্য জানার জন্য গ্রামীণ মানুষের ক্ষেত্রে কোনও ফী ধার্য করেনি। আমাদের জনদরদি গরীবের সরকার গ্রাম শহর নির্বিশেষে সকলের জন্য ফী ধার্য করেছে দশটাকা হারে। তাও কোর্ট ফী ছাড়া অন্য কোনও ভাবে ফী দেওয়া চলবে না। আমাদের রাজ্যকে টেক্কা দিয়ে বিহার ১৫০টি তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত রেকর্ড করে রেখেছে তার ওয়েবসাইটে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের ওয়েবসাইটটি সবচেয়ে দুর্বল ও হাস্যকর। কর্ণাটক সরকারের তথ্য কমিশনে ১৪টি মিটিং এবং বিভাগীয় সচিবদের প্রতি নির্দেশিকা লিপিবদ্ধ করা আছে। সেখানে কমিশন স্পষ্ট করে সচিবদের নির্দেশ দিচ্ছে কোনও অজুহাতে তথ্যের অধিকার থেকে মানুষকে যেন বঞ্চিত না করা হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলনেত্রী একাধিকবার দাবি তুলেছেন, চ্চড্ডট্র ও টাটা কোম্পানির সঙ্গে সিঙ্গুরের গাড়ি নির্মাণের গোপন চুক্তিটি প্রকাশ্যে আনার, অথচ মানুষ এখনও জানে না চুক্তির প্রকৃত তথ্য। নয়াচরে সালিমের প্রকল্পের জন্য জমি নেওয়া হচ্ছে, কী হবে, কতদিনে হবে এবং কী শর্তে হবে—কেউ জানে না। সারা পশ্চিমবঙ্গেই জমি নেওয়া হচ্ছে, পাঁচতারা হোটেলে চুক্তি হচ্ছে, ঘটা করে ফলাও করে তা কাগজে ছাপাও হচ্ছে, সঙ্গে অজস্র চাকরি, কর্মসংস্থানের রঙিন স্বপ্ন। তার বেশি কেউ কিছু বলতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গের তথ্য কমিশন থেকে আমরা কেবল একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছি—২০০৬ সালের জানুয়ারিতে জনৈক রাজনীতিবিদের তথ্য অনুসন্ধানের কারণে কমিশন জানাতে বাধ্য হয় যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৮৭ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ১৪ বার বিদেশ ভ্রমণ করে রাজ্য কোষাগারের ১৮, ২৫, ৬০০ টাকা ব্যয় করেন এবং ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪, ৬০, ৭৭২ টাকা বিদেশ সফরে ব্যয় করেন (দ্য স্টেটসম্যান ২৬ জানুয়ারি ২০০৬)। তথ্য জানার অধিকার আন্দোলনের ফলে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ২০০৯ সালের ১১ জুন এক ঐতিহাসিক ঘোষণা করে সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন দফতর ভিত্তিক ওয়েবসাইটে এবং নোটিশে সরাসরি কাজকর্মের সমস্ত রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরতে। যাতে সাধারণ মানুষের 'তথ্যের অধিকার আইন' সম্পর্কিত অর্থ ব্যয় করতে না হয়। অথচ এরাজ্যে রাজ্যসরকার তাতে আগ্রহী নয় কারণ কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে। গত বত্রিশ বছরে বিভিন্ন সরকারি দফতর এবং অসংখ্য সরকারি সংস্থা কীভাবে অর্থের অপচয় ঘটায়, জনগণের কষ্টার্জিত রাজস্বের অর্থ তছনছ করে এবং বাজেটের বরাদ্দ অর্থ এবং কেন্দ্রের অসংখ্য প্রকল্পের টাকা কীভাবে এরাজ্যে নয়ছয় হয় তার হিসাব-নিকাশ প্রকাশ হয়ে যাবে। এই সরকার তাই বোবা এবং কালা। তথ্যের অধিকার আইনও এখানে তাই খাতায় কলমে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

# সামাজিক বিভাজনেরই অন্য নাম

*(১ পাতার পর)*

দশ বৎসরে বিশেষ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ওই উপেক্ষিত মানুষদের জন্য কিছুটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যাবে, যার পর সংরক্ষণের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধান জারি হওয়ার ষাট বৎসর পরেও সংরক্ষণ ব্যবস্থা তো বন্ধ হয়ইনি, পরন্তু সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরও অনেক প্রসারিত হয়েছে, তাকে স্থায়ী করা হয়েছে, আর তা প্রসারিত হয়েছে এমনসব ক্ষেত্রে যেখানে সংরক্ষণ করার কোনও প্রয়োজনই নেই। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনও সামাজিক বা অর্থনৈতিক শ্রেণীর সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে না, কিছু ধূর্ত ও সুবিধাবাদী লোক তৈরী করা হয় ওইসব পশ্চাদপদ শ্রেণীর মধ্যে। এই স্থায়ী সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারিত করার জন্য দায়ী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। এমন একটিও রাজনৈতিক দল নেই যার সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না। যারা একটি মাত্র কারণ হলো, রাজনৈতিক সুবিধালাভের হীন ইচ্ছা। এই পাপব্যবস্থার আধুনিকতম নিদর্শন হল মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা।

সংরক্ষণ ব্যবস্থার সব চেয়ে কুৎসিৎ দিক হলো, এতে যোগ্যতাকে মর্যাদা দেওয়া হয় না এবং জনস্বার্থকে, জনগণের সামূহিক জীবনকে বিপদজ্জনক অযোগ্য লোকেদের হাতে সমর্পণ করা হয়। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। একজন অল্পমেধার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে সরকারি চিকিৎসকে পরিণত করা হলে অসংখ্য রোগীকে অযোগ্য হাতে চিকিৎসার জন্য সমর্পণ করা হয়। একজন সরকারি চিকিৎসক তাঁর কার্যজীবনকালে যদি লক্ষ মানুষের চিকিৎসা করেন, তাহলে ভাল চিকিৎসকের হাতে তিন হাজার লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে, যা অযোগ্য চিকিৎসকের হাতে পাঁচ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটবে। অর্থাৎ, সংরক্ষিত এক ব্যক্তিকে চাকরী দেওয়ার জন্য বাড়তি দু'হাজার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে যাবে, যাদের মধ্যে অনেকেই সংরক্ষিত শ্রেণীর লোক থাকবেন। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, যেখানে ব্যক্তিগত যোগ্যতার ঘাটতি ঘটলে বহু মানুষের পক্ষে বিপদজনক, সেখানে যোগ্যতাই একমাত্র নির্ণায়ক হওয়া আবশ্যিক। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকেও ছাড় দেওয়া চলে না।

সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে যে সংরক্ষণের উদ্যোগ হয়েছে, তার ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা, যা সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী ও অন্যায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হলেই তিনি সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন এমনটা হলে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, সামাজিক ও বর্ণগত বৈষম্য মুসলমান সমাজেও প্রকটভাবে আছে, অর্থাৎ, মুসলমান তপশীলি বলেও কিছু আছে। যে মূল ভিত্তির উপরে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা হলো, সামাজিক ও বর্ণগত বৈষম্য একান্ত ভাবেই হিন্দু সমাজের ব্যাপার। সংবিধান রচনার কাল থেকে সংবিধান নির্মাতারা স্বীকার করে নেন যে, অহিন্দু সমাজে কোনও বর্ণ সামাজিক ভেদ নেই। যে কংগ্রেসী নেতৃত্ব সংবিধান চালু করেন তার এমন বিপরীত অবস্থান আরম্ভ করার একটি মাত্র কারণ হলো, মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক তৈরী করে মুসলমান ভোট টানা। অবশ্য, কংগ্রেস ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী দল ও নানা আঞ্চলিক দল একই সঙ্গে মুসলমান তোষণের এই অশুভ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এটা কোনও মতেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা নয়, কেবল তোষণনীতি দ্বারা ভোট সংগ্রহের হীন প্রচেষ্টা, যার অবশ্যম্ভাবী ফল অধিকতর সাম্প্রদায়িক বিভাজন। জার্মান দার্শনিক উইল হেলম্ ক্রিডরিশ হেগলে বলেছিলেন, ইতিহাস থেকে আমরা এটাই শিখি, ইতিহাস থেকে মানুষ কিছু শেখে না। আমরা ইতিহাস থেকে একথা শিখেছি যে, সাম্প্রদায়িক তোষণনীতি সমাজে ও দেশে বিভাজন ঘটায়। কিছু গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলমানের খিলাফৎ রক্ষার দাবীকে গান্ধীজী ভুল করে সমর্থন করেছিলেন এবং খিলাফৎ আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একত্রিত করেছিলেন। তাতে তিনি মুসলমানদের কোনওভাবেই ভারতীয় মূলস্রোতের মধ্যে আনতে পারেন নি, যেমন, জিন্নাকেই মুসলমান সমাজ ধরে নিয়ে সেদিন পর্যন্ত তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টায় সামূহিকভাবে ব্যর্থ হন তিনি। যাঁর শেষ ফল রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ত্রিখণ্ডিকরণ এবং এখনও এক চরম শত্রুদেশকে দেশের সর্বকালীন বিপদ রূপে গড়ে তোলা।

আসলে, ভারতের রাজনৈতিক নেতারা দেশপ্রেমিক নন, তাঁদের কাছে সাময়িকভাবে নির্বাচনে কিছু সুবিধালাভ করার জন্য দেশের আবার সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটানোটাও বড় কথা নয়। তবে একথা ওই স্বার্থপর নেতাদের বলে কোনও লাভ নেই। কারণ, তাঁদের ধারণাই এই যে মুসলমান স্বার্থমানেই কিছু গোঁড়া মোল্লার স্বার্থ। শাহবানু মামলায় রাজীব গান্ধী কিছু মোল্লার সমর্থন লাভের আশায় সমগ্র মুসলিম নারীসমাজের ক্ষতি করেছেন। মুসলমানদের প্রকৃত স্বার্থের কথা কেউ কোনও দিন ভাবেননি।

ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রকৃত উন্নতি শতকরা কয়েকভাগ চাকুরী সংরক্ষণের মাধ্যমে কোনদিনই আসতে পারে না, তার জন্য যা করা দরকার তার মূল সূত্র হলো তিনটি।

১। শেখ মুজিবর রহমানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আপনার ভাবনা কি? তিনি বলেছিলেন, এদেশের মানুষের একটাই পরিচয় হওয়া উচিত, তাহলো সে বাংলাদেশী, সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু নয়। তিনি তাঁর দেশে ওই বোধ চালু করতে পেরেছিলেন কিনা সেটা অন্য কথা। কিন্তু তার উক্তিটি সঠিক। ভারতের ক্ষেত্রেও এখনও ওই নীতি ঠিক। ভারতের মানুষের একটি মাত্র পরিচয় হতে হবে যে, সে ভারতীয়, সে হিন্দু, মুসলমান না খৃষ্টান, সেকথা আসবেই না, সে বাঙালী, বিহারী না মারাঠি না তামিল, এমন পরিচয় অবাঞ্ছনীয়। সরকার নিজেই যদি সমাজ ও জাতিকে সংখ্যালঘু না সংখ্যাগুরু এই ভিত্তিতে বিচার করেন, তবে সরকার নিজেই দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক এটা স্পষ্ট।

২। সমগ্র জাতির পরিচয় যদি হয় সেই জাতির মানুষের একমাত্র পরিচয় ভারতীয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই দেশের সমস্ত মানুষের জন্য একই অনটন ও আর্থসামাজিক নীতি চালু থাকা উচিত।

সরকারী চাকুরীর প্রধান শর্ত শিক্ষা। সমগ্র মুসলমান সমাজ হিন্দুদের মতোই শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করুন এবং যোগ্যতার অধিকারে তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক স্থান গ্রহণ করুন এটা ন্যায্য কথা। তার জন্য সকলকেই এক উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আসতে হবে। মক্তবী ও মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের পাঠের চেয়ে প্রবলতর ভাবে দুলতে দুলতে ধর্মগ্রন্থপাঠ করে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। ওই শিক্ষাতে কিছু অর্ধশিক্ষিত গোঁড়া ব্যক্তি তৈরি করা যায় এবং দেশবিরোধী সন্ত্রাসবাদীও তৈরী করা যেতে পারে, কিন্তু যোগ্য সুনাগরিক তৈরী করা সম্ভব নয়। অথচ সরকার ওই শিক্ষাকে শুধু যে বজায় রেখেছে তা নয়, তাদের অধিকতর অর্থ ও সুবিধা দিয়ে পোষণ করছে। এতে এটাই স্পষ্ট হয় যে, সরকার মুসলমানদের যোগ্য ভারতীয় করতে চায় না, মোল্লা পরিচালিত এক গোঁড়া ভোটব্যাঙ্ক তৈরী করাই তাদের উদ্দেশ্য, যদিও ঐ ভোটব্যাঙ্ক যে তাদের হাতেই আসবে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

৩। শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য অগ্রগামী সামাজিক ব্যবস্থা দরকার। যেখানে সমাজই পশ্চাৎপদ সেখানে যোগ্য নাগরিক গড়ে ওঠে না। সমাজের অর্ধেক মানুষই নারী। যে সমাজের অর্ধেকাংশ তালিবনী আদর্শে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে, শিক্ষাক্ষেত্রকে বর্জন করে, সেই সমাজের নারীরা বা তাদের সন্তানেরা যোগ্য নাগরিক ও যোগ্য কর্মপ্রার্থী হবেন, এমনটা আশা করা যায় না। তবে তাতে সরকারের বা ধর্মান্ধদের কিছু যায় আসে না কারণ, তারা মুসলমান সমাজের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা করতে চায় না। তারা চায় এমন মানুষ তৈরি হোক, যারা পৃথিবীতে সুস্থচিন্তা নিয়ে সুস্থ পদক্ষেপ ফেলে চলতে কোনদিনই শিখবে না, তারা হোক এমন মানুষ যারা ধর্মবিপন্ন এই বোল শুনলেই হৈ হৈ করে উঠবে, নেতা ও সমাজের কর্তাদের অঙ্গুলি হেলনে ওঠা বসা করবে এবং চিরকাল সংরক্ষণের যষ্ঠি ভর করে দেশ ও জাতির বোঝা স্বরূপ হবে।

৪। সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণের ফলে ক্রমশ দেখা যাবে রাজ্যে রাজ্যে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, এক অশুভ প্রতিযোগিতকে অন্যায় সুবিধা দিয়ে জনপ্রিয় হতে পারে। তার কোনও শেষ নেই, যা আনতে পারে আবার এক সামাজিক দেশবিভাজনের বিভীষিকা।

এই অবস্থার প্রতিকারে সরকার বা দুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আবেদন করে ফল হবে না। সংগঠিত ভারতীয় চেতনা, যেখানে সমবেত হতে হবে সমগ্র হিন্দুসমাজ ও প্রগতিশীল অহিন্দু সমাজকেও। তারাই পারে সামাজিক বিভাজনের এই অশুভ প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করতে।

# মূল্যবৃদ্ধি রোধে উদাসীন

*(১ পাতার পর)*

তথাকথিত কিছু সাংবাদিকের। মূল্যবৃদ্ধির চাপে নাভিশ্বাস ওঠা সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা লিখলে সংবাদপত্রের মালিকদের আর্থিক লাভ নেই। উল্টে ক্ষমতাসীন দলের বিরাগভাজন হতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সংসদে বলেছেন যে গত খরিফ মরশুমে খরার কারণে কৃষি উৎপাদন মার খাওয়ায় এমন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। এটি পুরোপুরি সত্য নয়। খরাজনিত কারণে বাজারে কিছুটা প্রভাব পড়ে ঠিকই। তবে সে কারণে গড়ে কুড়ি শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি হয় না। যা এবার হয়েছে। বিগত এনডিএ সরকারের আমলে ২০০০-০২ সালে টানা দু'বছর দেশজুড়ে খরা হয়েছিল। কিন্তু খরা পরিস্থিতির শুরুতেই এনডিএ সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের বাজার দর মাত্র সাড়ে তিন শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রাকৃতিক নিয়মেই দেশে খরা বন্যা ইত্যাদি হয়। তাই সভ্য জনস্বার্থরক্ষাকারী সরকারের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা।

বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার সেই অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যটুকু করেছিল বলেই টানা দু'বছর খরা চলার পরেও ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়নি। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি। যা' এবার কংগ্রেসের দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে ঘটেছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন ২০০৯ সালে খরাজনিত কারণে কৃষি উৎপাদন ১৮ মিলিয়ন টন কম হয়েছে। তাই গড় মূল্যবৃদ্ধি ২০ শতাংশ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বয়ানকে সত্য বলে ধরে নিলে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিৎ যে ২০০২ সালে এনডিএ সরকারের আমলে খরাজনিত কারণে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ৪০ মিলিয়ন টন কম হয়েছিল। তারপরেও এতটা দাম বাড়েনি। এর কারণ, খরা পরিস্থিতির শুরুতেই ধীরে ধীরে ৬৬ মিলিয়ন টন চাল গমের মজুত খাদ্যভাণ্ডার গড়েছিল। এই ভাণ্ডার থেকেই খরাক্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে এনডিএ সরকার 'ফুড ফর ওয়ার্ক' প্রকল্পে দরাজহাতে বিনামূল্যে চালগম সরবরাহ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। দুঃখের কথা, আবহবিদরা ২০০৮ সালেই খরার আগাম সতর্কতা জানালেও ইউপিএ সরকারের কোনও হেলদোল ছিল না। তখন সোনিয়া মনমোহন সিং-রা আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি এবং বামদলের হুমকির মোকাবিলায় ব্যস্ত ছিল। দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের চেয়ে কংগ্রেসের কাছে দলীয় স্বার্থ তখন বড় ছিল। বামেরা সমর্থন প্রত্যাহার করলে সরকার বাঁচাতেই মনমোহন সিং-রা তখন তৎপর ছিল। আর এখন তাঁরা নির্লজ্জের মতো প্রকৃতিকে দোষারোপ করে দায়মুক্ত হতে চাইছে। শেম...শেম।

# মাওবাদীরা যোগ দিচ্ছে সি পি এমে

*(১ পাতার পর)*

নেতৃত্বের কাছে খবর রয়েছে। সিপিএমের একটা সূত্র বলছে, পি ডব্লিউ জি এবং এম সি সি-র যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়া ও উত্তর-চব্বিশ পরগণার যুবকদের মধ্যে একটা অতি-বাম মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও অন্যান্য নামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিছু অতি বাম ভাবধারার যুবক আছেই।

আলিমুদ্দিন দেখেছে এই দুর্মুল্যের বাজারে ক্যাডার পাওয়া বেশ মুশকিল। সুতরাং মাওবাদীরা যদি তাদের দলে আসে তবে আপত্তির সেভাবে কারণ নেই। কিন্তু এর পেছনে কিষেণজীর অন্য কোনও চাল আছে কিনা, সেটা নিয়েই বেশ ধন্দে রয়েছে সিপিএম। উপরন্তু মাওবাদীরা সিপিএমে এলে, নিচের তলায় সিপিএম-মাওবাদী সুসম্পর্ক প্রকাশ্যে আসার একটা নিকট সম্ভাবনা থেকেই যায়। সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে খানিকটা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' অবস্থায় রয়েছে আলিমুদ্দিন।

# হিন্দুত্বকে অপমানের ট্রাডিশান

*(১ পাতার পর)*

ভাবে ওঠা উচিত, সেটা উঠছেও। কেউ সস্তা পাঠক ও বস্তাপচা জনপ্রিয়তার লোভে পর্ণোগ্রাফি সম্বলিত রচনা লিখতেই পারেন, সে স্বাধীনতা তাদের আছে, কিন্তু তার জন্য ঐতিহাসিক আদর্শ চরিত্রগুলোকে ভাড়া করা কেন? তবে কি চরিত্রের ভাঁড়ারে টান পড়েছে? জনপ্রিয়তার নিরীখেও সেই ভাটার টান কি এবার শুরু হবে? হাজারো প্রশ্নের মাঝে সর্বশেষ খবর, বিজেপি সাংসদ ভর্তৃহরি মেহেতাব গত ৪ঠা মার্চ লোকসভা অধিবেশনের জিরো আওয়ারে সংশ্লিষ্ট বইটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্য রাজনীতি

# পৌরসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক

**নিশাকর সোম**

রাজ্যে ৮২টি পৌরসভার নির্বাচন এগিয়ে আসছে। এবারের নির্বাচনে একটা সমস্যা থেকে পার্টি মুক্ত হতে পেরেছে। তা' হলো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য লড়াই। প্রার্থী হওয়ার জন্য লড়াই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে শুরু থেকেই আছে। সুদূর অতীতে কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে মনোনয়ন না-পাওয়াতে লক্ষ্মী সেন পার্টিকে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁকে অশোক মজুমদার প্রমুখেরা সমর্থন করেছিলেন। এ কথা সাংবাদিকরা জেনে ছিলেন পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক জলি কল এবং পৌরনির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত বীরেন রায় ও শৈল মুখার্জির কাছে থেকে। সেই ট্র্যাডিশন থেকে কলকাতা পার্টি মুক্ত হতে পারেনি। পরবর্তীতে দক্ষিণ বেলেঘাটার একটি কেন্দ্রে সিপিএম পার্টি কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী জয়গোপাল রায়কে প্রার্থী ঠিক করেছিল। কিন্তু পার্টিকর্মীদের চাপে পরে সেখানে বাদল করকে প্রার্থী করা হয়। বাদল কর এখন সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তবে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে প্রার্থীদের সংখ্যা শূন্যে পরিণত হয়েছে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে দলাদলি শুধু কলকাতা পুর নির্বাচনেই হয়েছিল এমন নয়। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটিতে কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির অমূল্য উকিল-কে নিয়েও বিতণ্ডা হয়েছিল। এই সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রখ্যাত গায়ক-চিকিৎসক প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ শৈলেন দাশগুপ্তকে হত্যা করা হয়েছিল। সে ঘটনা কাগজে প্রকাশিত। সেই হত্যাকারীদের সঙ্গে নিয়ে দমদমের সিপিএমের একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়েছিল।

আসলে নির্বাচনে জেতাটাই মুখ্য লক্ষ্য। জেতার পর দুধে-ভাতে থাকা যায়, আখের গোছানো যায়। কনট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে "পাক"-(দস্তুরী) পাওয়া যায়—মন্দ কি? এ-ছাড়া চাকরি-বাকরি টেন্ডার দেবার অবাধ ক্ষমতা পাওয়া যায়। এই লোভই তো খুনী হতেও সাহায্য করে, নাকি?

আগামী পৌর নির্বাচন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। বর্ধিত কলকাতা জেলা কমিটির সভার দলিলতো বেসরকারি দূরদর্শনের চ্যানেলের হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে—বেনোজল ঢুকে পার্টিকে শেষ করে দিচ্ছে। দেবে না কেন—এদের উদয়েই নির্বাচনকে "ওয়ান ডে ম্যাচ" করানো হত। মহঃ সেলিমও তো নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেছিলেন—"ওয়ান ডে ম্যাচ"। মানব মুখার্জি বক্তৃতায় বলেছিলেন, "বিরোধীদের দেওয়াল লেখার কালিতে দেওয়ালে লেখার সুযোগ থাকবে না, গালে লাগাতে হবে।"

এসব কথা বলে নিচের তলার পার্টিকর্মীদের মার্সিনারিতে পরিণত করা হয়েছে। তার ফল এখন ফলতে শুরু করেছে। নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আতঙ্কে নিচের তলায় কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষা না দিয়ে হুকুমদার বরকন্দাজ করা হয়েছিল। এখন প্রমোটারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের এবং বসে যাওয়া কর্মীদের দূর হঠানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই চেষ্টার মধ্যে বড় ফাঁক আছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের মধ্যে একজনকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। তাঁকে তাড়িয়ে বলা হচ্ছে "পরে আবার তোকে তুলে আনবো—সময় আসুক।" একটা কথা পূর্ব কলকাতায় চালু হয়েছে—যে একজন লোকাল কমিটির দুর্নীতিগ্রস্ত সম্পাদকের দুর্নীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে দু-তিনবছর লেগেছিল। তবেই বহিষ্কার করা হলো। এই এলাকায় সদস্যগণ রকে বসে আলোচনায় করে জেলা কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে এমন গল্প চালাচ্ছে তা বেলগাছিয়াতে বসেই শোনা যায়।

> "বামফ্রন্টের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলেছে। কলকাতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তর্ঘাত হবেই। বর্তমান কাউন্সিলারদের আধিকাংশেরই বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা আছে।"

কলকাতা পুরসভার কার্যকলাপ নিয়ে বর্তমান মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়ে সমালোচনা উঠেছে। মেয়র তো আংশিক সময়ের কর্মী। বিকাশবাবুর মেয়র হবার পটভূমি হলো—মেয়রপদে একাধিক প্রার্থী লড়ছিলেন—দিলীপ সেন, কান্তি গাঙ্গুলি প্রমুখ। তাই রাজ্য-নেতৃত্ব বিকাশবাবুকে মেয়র করেন। তখন কলকাতা জেলা-সম্পাদকমণ্ডলী বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরাজিত মেয়র প্রশান্ত চ্যাটার্জিকে বসিয়ে দেওয়া হয়। যে মেয়র পদে একদা জে এম সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে অধ্যাপক সতীশ ঘোষ, ডঃ ত্রিগুনা সেন বসেছিলেন, সেখানে প্রশান্ত চ্যাটার্জির মতো সিপিএম নেতাও বসেছিলেন। এরই আমলে ড্রেনের খোলামুখে ছেলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়। লোকসভা নির্বাচনে প্রশান্তবাবু পরাজিত হন। এরকমভাবেই কলকাতার বর্তমান বেশিরভাগ কাউন্সিলার পরাজিত হবেনই। এ-অবস্থা শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র রাজ্যেও। ঔদ্ধত্য, টেন্ডারের কাটম্যানি, আত্মীয়দের চাকরি-টেন্ডার পাওয়া ব্যবস্থা করা অবাধে চলেছে।

প্রসঙ্গত পাঁচ-এর দশকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে সংযুক্ত নাগরিক কমিটি গঠন করে বহু নন-পার্টিকে কাউন্সিলার করে লাভবান হয়েছিল। এর প্রথম পরিবর্তন ঘটল ১৯৬৯ সালে। কলকাতা পুর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এল—আহ্বায়ক ছিলেন সিপিএম-এর সুধাংশু পালিত ও ফরওয়ার্ড ব্লকের হরিদাশ ব্যানার্জি। সেখানেই সুধাংশু বনাম সিপিএমের নন্দ ভট্টাচার্য-র লড়াই শুরু। সমাধানে এগোলেন সিপিআই নেতা কমলাপতি রায়।

আজও বামফ্রন্টের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলেছে। কলকাতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তর্ঘাত হবেই। বর্তমান কাউন্সিলারদের আধিকাংশেরই বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা আছে। কলকাতা পৌরসভার মেয়র পরিষদের চেয়ারম্যান পরাজিত বিধায়ক নির্মল মুখোপাধ্যায় মেয়র পদের জন্য ইচ্ছুক।

কলকাতা জেলা সিপিএম মেয়র পদে আবু সুফিয়ানকে নিয়ে ভাবছে। বুদ্ধবাবু মহম্মদ সেলিমকে প্রজেক্ট করতে চান। আর এস পি-ফরওয়ার্ড ব্লক ঝোপ বুঝে কোপ দেবেই। যার শেষ কথা বলবে রাজ্য-নেতৃত্ব। ১৯-২০ মার্চ-এর রাজ্য কমিটি সভার পর রাজ্য-নেতৃত্ব নীতি ঠিক করে যে প্রতিটি পৌরসভার প্রার্থীর তালিকা স্ক্রিনিং করবে। যাঁর সম্বন্ধে ছিঁটেফোঁটা কলঙ্ক থাকবে তাকে বাদ দেওয়া হবে কিনা এটা বলা যায় না, দেখা যাক ট্যাগ-অফ-ওয়ারে কে জেতে। যাই হোক, কলকাতা পুরসভা সহ ৩৬ পুরসভা হাতছাড়া হবেই বামফ্রন্টের। ২০টিতে সম্ভাবনা কম এবং বাকিগুলিতে বামফ্রন্ট এখনও এগিয়ে। এরপরে দেখা যাবে কংগ্রেস-তৃণমূল লড়াই।

অন্য রকম

# হৃদয়বীণার মাঝে

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** আনন্দধারা বহিছে কোহিমায়। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে প্রকৃতি যেন নিজের সমস্ত রঙ, রূপ, রস, গন্ধ বর্ণ যা কিছু তার ভাল জিনিস আছে সেইসব উজাড় করে দিয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাজারো সন্ত্রাস সত্ত্বেও জীবন থেমে থাকেনি উত্তর-পূর্ব ভারতে। যার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝে একফোঁটা কোহিমা-ডিমাপুর রাস্তার ধারে অবস্থিত কোহিমা অরফানেজ। 'অরফানেজ' শব্দটার অস্তিত্ব সেখানে কেবল সাইনবোর্ডেই। কারণ জনা চুয়াত্তর ছেলে-মেয়ে ওখানে বেড়ে উঠছে, তাদের মোটেই 'অরফ্যান' বা 'অনাথ' বলা যায় না। ছিয়াশি বছরের মাতৃদেবী ঝাফুটো আঙ্গামীর মাতৃচ্ছায়ায় যারা বেড়ে উঠছে, তাদের 'অনাথ' আখ্যা দেওয়া, কার সাধ্যি?

*ঝাফুটো আঙ্গামী*

সুতরাং 'খোঁজ' নেওয়া যাক এই ছিয়াশি বছর বয়সী 'মা'টির। নামটা তো জেনেই ফেলেছেন, ঝাফুটো আঙ্গামী। স্বামী ছিলেন সেনাবাহিনীর জওয়ান উমরাও সিং রাওয়াত। তাঁদের কন্যা একটিই, সুশীলা সিং রাওয়াত। ১৯৬৫ সালে উমরাও চলে যাবার পর ঝাফুটো ফিরে আসেন কোহিমায়। কোহিমা হাসপাতালে নার্সের চাকরি পান। তখন একটা স্বপ্ন প্রায়ই তাঁকে মোহবিষ্ট করত। তিনি দেখতে পেতেন তাঁকে ঘিরে যেন অনেক বাচ্চা ছেলে-মেয়ে খেলা করছে। ১৯৭৩ সালে হাসপাতালে নার্স থাকাকালীন দত্তক নেন প্রকৃত অর্থেই অনাথ এক বালককে। তার নাম রাখা হয় ডাইজেলি ঝাফুটো। এরপর একের পর এক হাসপাতাল, জঙ্গল, রাস্তার নর্দমায় পড়ে থাকা কিংবা কারুর রেখে যাওয়া অজ্ঞাত-কুলশীল বহু ছেলেমেয়েকে দত্তক নিয়েছেন তিনি।

কিন্তু এই অকস্মাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসা ভাই-বোনেদের জন্য নিজের যাবতীয় ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে বিসর্জন দিয়েছিল আঙ্গামী তনয়া সুশীলা ওরফে নেবানো। এমনকী স্কুলেও যেতে পারেনি সে। কিন্তু তা বলে তার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। আপাতত কোহিমা সেলস-ট্যাক্স অফিসে ক্লার্কের কাজ করছেন। তাঁর মাইনে এবং ঝাফুটো-র পেনশনের টাকাই আপাতত সম্বল তাঁদের। তবে গত বছর সি এন এন-আই বি এন আঙ্গামীকে রিয়েল হিরো সম্মানে ভূষিত করে। সেই সম্মানের টাকায় আপাতত মাথা গোঁজার ঠাঁই-মতো একটা বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই অনাথ-আশ্রমে চাল আর দালিয়া মেশানো ভাত, কুমড়ো আর জঙ্গলে পাতা দিয়ে সিদ্ধ ডাল আর নাগা-চাটনী খেয়ে এসে 'দৈনিক সংবাদ' প্রত্রিকার কার্যনিবাহী সম্পাদিকা পারমিতা লিভিংস্টোনের উপলব্ধি—"সোনা বাছা করে আমাদের সন্তানদের খাওয়াতে কত কষ্ট! অথচ খাবার খেয়ে যখন উঠলো কারুর পাতে একটা কণা ভাতও পড়ে নেই।"

## মাওবাদী মোকাবিলা

# শুধু সংঘর্ষ নয়, দরকার মূলস্রোতে ফেরানোর বন্দোবস্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মাওবাদী কার্যকলাপকে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন। এখন দেশের উন্নয়ন ও অখন্ডতা মাওবাদী সন্ত্রাসের ফলে কতটা বিঘ্নিত তা আলোচনা করা যেতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চারটি রাজ্যের (ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গ) মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতের পথে অগ্রসর হতে যাচ্ছেন। কেননা মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা সন্ত্রাস বন্ধের শর্তে আলোচনা সাপেক্ষে মাওবাদী সমস্যার সমাধানের যে আহ্বান চিদাম্বরম দিয়েছিলেন তা মাওবাদী শীর্ষনেতৃত্ব প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে অবশ্য কলকাতায় তেলেগু দীপক (ভেঙ্কটেশ্বর রাও) ধরা পড়ায় সুর নরম করেছেন।

এখন এই অতি বাম সন্ত্রাস বিষয়ে নানারকম সম্ভাবনা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে এবং তা রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মহলে এবং সংবাদ মাধ্যমেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথমত এই অতি বাম উগ্রপন্থা ছপ্তুন্দ্বন্দ্রদ্ধ ভ্রন্ধন্দ্বপ্রদ্ধজনপ্পনন্দ্বপ্পন্দ্বগ্ন দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ যা দেশের মধ্যে ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিছু বামপন্থী গোষ্ঠী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে, অনেকেই মাওবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে সামনে আসছে। অথচ ঘটনা হলো মাওবাদ আদর্শ হিসাবে মৃত এবং আধুনিক বিশ্বে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। মাওবাদের উৎসভূমি খোদ চীনই মাওবাদকে পরিত্যাগ করেছে বলা যায়। এই সমস্যার আশু সমাধানে এক পক্ষের অভিমত—কেন্দ্র এবং রাজ্য মিলে ‘‘গান টু গান স্ট্র্যাটেজি’’ গ্রহণ করুক। আবার আর এক পক্ষের অভিমত—মাওবাদীদের মূল রাজনীতিক ধারায় সম্মিলিত করা হোক। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই বামপন্থীদের একটা অংশ সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। আবার কেউ কেউ বন্দুকের ভাষায় বিশ্বাসী। ফলে অতিবাম সন্ত্রাসীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে এবং বাড়ছে।

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষক অমিত বাসলে বর্তমান বামপন্থী রাজনীতিকে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এক, সংসদীয় পথের অনুসারী যাকে দীপঙ্কর বসু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেফট্ নামে চিহ্নিত করেছেন। এদের মধ্যে সিপিআই, সিপিএমও তাদের সহযোগী দলগুলি রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ হল সিপিআই (মাওয়িষ্ট), সিপিএম(এমএল) এবং অন্যান্য ছোটখাট মাওবাদী দল যাদেরকে কমিউনিস্ট নন্ পারলামেন্টারি লেফ্ট্ (CnPL) বলে অভিহিত করা হয়। তৃতীয় ভাগটি হলো পিপলস মুভমেন্ট লেফট্ (পিএমএল)। যাদের কখনও কখনও “Non Party left” বলা হয়। এদের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন National Allaience of Peoples movement নামে ছাতার তলায় রয়েছে। এই মুহূর্তে SDL (Social Democratic Left) গোষ্ঠীভুক্তরা সংকটের মধ্যে। কেননা নির্বাচনে তাদের ব্যাপক পরাজয় ঘটেছে। নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে। এর একটা কারণ হলো সঠিক আদর্শের অভাব। এই SDL-রা ইউরোপিও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে নিজেদের বেশী করে জড়িয়েছে। এখানে বলা হয়েছে Industrial Capitalism সমাজতন্ত্রের দিকে উত্তরণের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষত রাশিয়া ভেঙ্গে যাওয়ার পর তথাকথিত সাম্যবাদী আদর্শের দেউলিয়াপনাই প্রকট হয়ে ওঠে।

আরেকজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নিশিকান্ত মহাপাত্র তাঁর লিখিত প্রবন্ধ Competitive Violence–State verses Ultra-left-এ প্রশ্ন তুলেছেন, বন্দুক কী গণতন্ত্রকে আরও কার্যকরী করতে পারে? তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অতি উগ্র বামপন্থী এই আন্দোলন রাষ্ট্রশক্তিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন—পুলিশ, নিরাপত্তাবাহিনী, রেল কন্ট্রাক্টর, ধনী ব্যবসায়ী এবং সর্বোপরি রাজনীতিবিদদের টার্গেট করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ লুটপাট করা, ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রাখা এবং বহুচর্চিত ‘রেড করিডোর’ তৈরির মতো কাজকর্ম সরাসরি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম এই মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একসূত্রী যোজনা অর্থাৎ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এমনকী বিভিন্ন বামপন্থী দল লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করেছে। ২০০৩ সালে মাওবাদীদের উপস্থিতি দেশের ৫৫ জেলাতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে মাওবাদীরা দেশের ১৩টি রাজ্যের ১৬০টি জেলাতে তাদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে। ওই বছরই ঝাড়খণ্ডে ১১৩ জন, ছত্তিশগড়ে ১০২ জন এবং উড়িষার ১০০ জন মাওবাদী সন্ত্রাসে মারা গিয়েছেন। এই সংখ্যাটাই মাওবাদীদের বাড়বাড়ন্ত সম্পর্কে দিশা নির্দেশ করে। অতিবাম সন্ত্রাসের হিংস্রতা রাষ্ট্রশক্তিকে নিরাপত্তাবাহিনীর ব্যবহারে বাধ্য করেছে। Violence এবং Counter Violence চলছে। প্রশ্ন উঠছে উন্নয়ন কাদের জন্য! উন্নয়নে কারা লাভবান? বন্দুক আমাদের শিক্ষা দিতে পারবে না অথবা গণতন্ত্রকেও কার্যকরী করতে পারে না।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, Poseo প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি কর্তৃক মিত্তল এবং বেদান্ত হঠাও আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, দলিতদের মন্দিরে প্রবেশ, সকলের জন্য শিক্ষা এবং তথ্য জানার অধিকার, প্রশাসনকে কৈফিয়ত দেওয়ানো প্রভৃতি বিষয় সর্বসাধারণ সমাজে সমাদৃত হওয়া আবশ্যক। এইসকল আন্দোলনে মাত্রারিক্ত রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ সরকারের সামাজিক পরিকাঠামোয় হস্তক্ষেপের সমান। অন্যদিকে সিভিল সোসাইটি অর্থাৎ সজ্জন সমাজ প্রাচীনকাল থেকে জনজাতির মানুষ, দলিত এবং বনবাসীদের বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার প্রয়াস করেছে। সিভিল সোসাইটির প্রভাবে যুব নেতৃত্ব, মহিলাদের সক্রিয়তা, সার্বিক শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য, জঙ্গল এবং অরণ্যের প্রাণীদের রক্ষা, অন্ধ কুসংস্কার দূর করে জাতপাতের বেড়া ভাঙ্গা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া প্রভৃতি বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে। তাই মাওবাদের উদ্ভবের কারণ এবং মাওবাদ যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তার সার্বিক বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা করা একান্ত প্রয়োজন।

*শিলদায় মাওবাদীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত পুলিশ ক্যাম্প।*

# দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য অসমের হাইলাকান্দি

সংবাদদাতা, হাইলাকান্দি ঃ অসমের মিজোরাম লাগোয়া হাইলাকান্দি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদলা অর্থাৎ United Democratic Liberation Army-এর দাপটে রামনাথপুর, খাড়মুড়া, সাহেবমারা, রাইফেলমারা, ঘুটঘুটি, ভাইছড়া, কপোলালা, কাকিয়ালা প্রভৃতি এলাকার সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আতঙ্কিত। এই এলাকায় জঙ্গিরা মূলত, অপহরণ করে বা আটকে রেখে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দাবী করছে।

সম্প্রতি ঘাড়মুড়ার ব্যবসায়ী সংস্থা বুলবুল এন্টারপ্রাইজের বাঁশবহনকারী লরির চালক মকরম আলিকে বন্দুকের মুখে অপহরণ করে জঙ্গলে নিয়ে যায়। পরে মকরম আলি সুযোগ বুঝে পালিয়ে আসে জঙ্গিদের কবল থেকে। পুলিশ এবং সি আর পি-র যৌথ অভিযানে দুই জঙ্গি হুসেন আহম্মদ ও আলিমুদ্দিন মারা পড়ে। পুলিশ দুটি মৃতদেহই উদ্ধার করেছে।

একসময় এই জঙ্গি গোষ্ঠীটি গঠিত করেছিল এলাকার রিয়াং জনজাতির একদল সাধারণ অপরাধী। ক্রমে সেই দলে ঢুকে পড়ে এলাকার মুসলিম সমাজবিরোধীরা।

রিয়াং জঙ্গি নেতা পঞ্চু রাম গত ২০০৮-এ আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক সমাজীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসে। রামনাথপুর বাজারে সে হোটেল খুলেছে, নাম ‘হোটেল ভবতারণ’। ফলে ফাঁকা নেতৃত্ব দখল করে মুসলমান সমাজবিরোধীরা। এলাকায় ঘুরে জানা গেল মুসলিম জঙ্গিরা দিন-দুপুরে জাতভাইদের ঘরে কাজের লোক, ‘দৈনিক মজুর’ বলে ডেরা গেড়েছে। প্রসঙ্গত, গত ’৯১ সেনসাস থেকে হাইলাকান্দি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে।

# নিজস্ব কম্যাণ্ডোবাহিনী গড়ল ছত্তিশগড় সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** জেহাদি ও মাও-মোকাবিলায় বেশ বড়ধরনের পদক্ষেপ নিল ছত্তিশগড় সরকার। বছর দেড়েক আগে মুম্বই-হামলার পর থেকেই নিজস্ব কম্যান্ডোবাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা করে রাজ্য সরকার। ব্ল্যাক-ক্যাট কম্যান্ডো ধাঁচের কম্যান্ডোবাহিনী গঠনের সেই পরিকল্পনা এবার রূপায়িত হওয়ার পথে। সরকারি তরফে জানান হয়েছে, শহরকেন্দ্রিক সন্ত্রাস (আরবান টেররিজম) রুখতে যে বিশেষ কম্যান্ডোবাহিনী গঠন করা হয়েছে তাদেরকে ছত্তিশগড়ের কাঁকের জঙ্গলে যুদ্ধের কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দেওয়াও হয়েছে। উদ্দেশ্য—মাওবাদী হামলা মোকাবিলায় দক্ষতা বৃদ্ধি। রাজ্য পুলিশের ডিজি বিশ্বরাজন জানিয়েছেন—"যদিও কম্যান্ডোদের যে কোনওরকম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত রাখা হচ্ছে, কিন্তু মূলত মাও-বিরোধী অভিযানেই তাদের পারদর্শী করে তোলার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।" মাওবাদীদের শক্ত গড় ছত্তিশগড়ে তাদের মোকাবিলায় এ. কে. জাতীয় আধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুগোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ কম্যান্ডোবাহিনীর ওপরই আপাতত আস্থা রাখছে সেখানকার পুলিশ-প্রশাসন।

গত বছরই আমলেশ্বর কেন্দ্রিক রাজ্য সশস্ত্র বাহিনীর তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের বেছে নেওয়া হয়েছিল ওই বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য। প্রসঙ্গত, ৩০ বছরের কম-বয়সী জওয়ানদেরই এতে মনোনীত করা হয়েছিল।

২৫০ জন কম্যান্ডোর একটি বাহিনীকে ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দুর্গের সদর-শহর আমলেশ্বর-এ পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, কম্যান্ডোরা পাঁচ বছর কাজ করার পর রাজ্য পুলিশবাহিনীতে যেখানে তাদের একদা পোস্টিং ছিল, সেই স্থানে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এখনও পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে ৮০০ কম্যান্ডো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পুলিশ আধিকারিকদের একটি সূত্র বলছে, মাওবাদীদের সঙ্গে লড়াই-এ দুই কোম্পানী কম্যান্ডোকে এখনও অবধি প্রস্তুত করা গিয়েছে। তবে এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হলো, কেন্দ্রের কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই স্রেফ ছত্তিশগড় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সন্ত্রাস মোকাবিলার এই ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছে।

যদিও এখনও অবধি কোনও বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হতে হয়নি ছত্তিশগড়কে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে খনি সমৃদ্ধ বস্তার এলাকা এই মুহূর্তে নকশাল অধ্যুষিত। যে কারণে সবমিলিয়ে ২০ ব্যাটেলিয়ন কেন্দ্রিয় সুরক্ষাবাহিনী (বি এস এফ) ও রাজ্য নিরাপত্তা বাহিনী (আই টি বি পি)-কে নিয়োগ করতে হয়েছে সেখানে।

সুতরাং এই কম্যান্ডোবাহিনী যে আগামীদিনে ছত্তিশগড় প্রশাসনের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

# আর্থিক মন্দার প্রকোপ থেকে মুক্ত গুজরাট

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** আন্তর্জাতিক দুনিয়া যেখানে এখনও অর্থনৈতিক মন্দার প্রকোপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পেশ করা সাম্প্রতিক বাজেটে ভারতও যে অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত;তার থেকে কিন্তু অনায়াসেই নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে গুজরাট। সম্প্রতি সেখানকার রাজ্য

*নরেন্দ্র মোদী*

বিধানসভায় বাজেট পেশের সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরেট অফ ইকনমিক্স অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিক্সের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সোসিও-ইকনোমিক রিভিউতে বর্ণিত তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করে 'অর্থনৈতিক মন্দা মুক্ত গুজরাট'-কে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে প্রাত্যহিক বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ রয়েছে। যেমন ২০০৮-এর শেষদিকে সারা বিশ্বজুড়ে যখন আর্থিক মন্দার প্রকোপ চলছিল, তখন গাড়ী অথবা দু-চাকার যান কিংবা সেলফোন বিক্রয়ের ঘটনা বড় একটা দেখা যায়নি। এই প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু মধ্যবিত্তের আর্থিক ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। এর পরের বছর অর্থাৎ ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে বরং ওই জাতীয় জিনিসপত্র কেনার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। গত এক বছরে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার দু'চাকার গাড়ী কিনেছেন গুজরাটবাসীরা। গুজরাটে গাড়ির সংখ্যা অর্থনৈতিক মন্দার বছরে (২০০৮-০৯) ছিল যেখানে ৯.৫ লক্ষ, চলতি আর্থিক বছরে (২০০৯-১০) তা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ১০.০৯ লক্ষে। সব মিলিয়ে গাড়ীর সংখ্যাটা গুজরাটে দাঁড়াচ্ছে— দু-চাকার গাড়ী ৮৪.২৩ লক্ষ, এছাড়াও চার চাকার গাড়ীর মালিকের সংখ্যা তো ১০ লাখের ওপরে আছেই। আর একথাও সর্বজনবিদিত যে, দেশের মধ্যে বোধহয় গুজরাটই সর্বাগ্রে থাকবে মোবাইল গ্রাহকের নিরীখে। সোসিও-ইকনোমিক সার্ভে বলছে, সাড়ে পাঁচ কোটি গুজরাটবাসীর মধ্যে দু'কোটি মানুষেরই মোবাইল রয়েছে। গাড়ী আর মোবাইলের চাহিদা থেকেই প্রতিবেদনটি প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, গোটা পৃথিবীতে যাই হোক না কেন, গুজরাটে কিন্তু আর্থিক মন্দার প্রকোপ এখন নেই।

তাদের এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে যোগ্য সঙ্গত করেছে মন্দার বছরগুলোতে রাজ্যে কর্মসংস্থানের হার। এই মাগ্গীগণ্ডার বাজারে গত '০৮-০৯ আর্থিক বছরে যেখানে কর্মসংস্থানের মাত্রা ছিল ১৮.৩৯ লক্ষ, '০৯-'১০ আর্থিক বছরে তাই বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.০৪ লক্ষে পৌঁছে যায়। স্রেফ সরকারি ক্ষেত্রেই নয়, বেসরকারি ক্ষেত্রেও এই বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য। গত আর্থিক বছরে বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজ করতেন ১০.৫৩ লক্ষ মানুষ। চলতি আর্থিক বছরে তা বেড়ে ১১.০৬ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে (এটা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) মোট কর্মীর সংখ্যা ৭.৮৬ লক্ষ থেকে বেড়ে ৭.৯৮ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছে। যদিও এই হারটা প্রত্যাশার থেকে বেশ কম (অর্থাৎ ডিসারেবল গ্রোথ নয়)। কিন্তু নাগরিক সংস্থাগুলোতে কর্মসংস্থান বেড়েছে প্রায় ২৫ হাজার (আগে ছিল ২.৮৬ লক্ষ, এখন হয়েছে ৩.১১ লক্ষ)।

উপরিউক্ত প্রমাণগুলো যদি আর্থিক মন্দাহীনতার পরোক্ষ প্রমাণ হয়, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত কর-আদায়ের ক্ষেত্রে। কিছু ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সুযোগ সত্ত্বেও সব ধরনের কর আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে ওই রাজ্যে। গত বছরের তুলনায় চলতি আর্থিক বছরে কর আদায় বেড়েছে ৪৮০ কোটি টাকা ('০৮-'০৯ আর্থিক বছরে ছিল ৬,২৮৪ কোটি টাকা, '০৯-'১০ আর্থিক বছরে তা পৌঁছোল ৬,৭৬৪ কোটি টাকায়)। একইভাবে আয়কর আদায়ও গত বছরে যেখানে ছিল ৫,২৯৪ কোটি টাকা, চলতি আর্থিক বছরে তা হলো ৫,৮৮১ কোটি টাকা। অন্যান্য করের ক্ষেত্রেও এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রযোজ্য। '০৮-'০৯ আর্থিক বছরে অন্যান্য কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকা। '০৯-'১০ আর্থিক বছরে এটাই বেড়ে হয়েছে ১২,৬৯৪ কোটি টাকা।

সবমিলিয়ে গোটা বিশ্ব, সেই সঙ্গে ভারতও যখন অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত তখন কর ছাড় দিয়েও প্রভূত কর আদায় করতে সমর্থ হলো নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট।

# বিয়াল্লিশটি জঙ্গিশিবির পাকিস্তানে কবুল প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যান্টনির

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** নয়াদিল্লীর তরফে ইসলামাবাদের সঙ্গে বিদেশ-সচিব পর্যায়ের আলোচনা শুরু হবার অব্যবহিত পরেই

*এ কে অ্যান্টনি*

কেন্দ্রিয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি আবার অভিযোগ করেছেন যে বিয়াল্লিশটি জঙ্গি-শিবির সক্রিয় রয়েছে পাকিস্তানে। যেগুলো নিয়ে ভারতের 'গভীর উদ্বেগে'র কারণ রয়েছে। একই সাথে বিদেশ-সচিব পর্যায়ের বৈঠক থেকে ভারত এখনই যে কিছু ফলপ্রসূ (অ্যান্টনি যাকে বললেন 'মিরাকেল') আশা করছে না তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রিয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর তরফে। রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের উপস্থিতিতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বায়ুশক্তির 'শক্তি-প্রদর্শনে' এসে আচমকাই যেন ক্ষণিকের জন্য 'জাতীয়তাবাদে আপ্লুত' হয়ে উঠেছিলেন অ্যান্টনি। যে কারণে বলে ফেললেন—"যে বিয়াল্লিশটি জঙ্গি শিবির এখনও সক্রিয় রয়েছে পাকিস্তানে, সেগুলো ধ্বংস করতে পাক-সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। এটাই ভারতের পক্ষে সবচেয়ে চিন্তার।" জঙ্গিদের পাক-মাটি ব্যবহার করতে না দেওয়া নিয়ে পাকিস্তানের পূর্ব-অঙ্গীকারও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। তবে ওই পর্যন্তই।

এখানেই জাতীয়তাবাদী মানসিকতার পঞ্চ ত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়ে 'কংগ্রেস সুলভ' চপলতায় পাকিস্তানকে জ্ঞান দেওয়ার পাশাপাশি জামাত-উদ-দাওয়া প্রধান হাফিজ সঈদের ভারত বিরোধী বক্তব্যকেও লঘু করে দেখতে চেয়েছেন অ্যান্টনি। বিয়াল্লিশটি জঙ্গি শিবির যে পাকিস্তানে রয়েছে তা কবুল করার পরেও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসবাণী—"আমি দেশবাসীকে এটুকু নিশ্চিত করতে চাই যে তাঁরা নিরাপদেই আছেন। আমাদের ভূমির প্রত্যেকটি ইঞ্চি পর্যন্ত সুরক্ষিত। কোনও হুমকিতে আমরা আদৌ বিচলিত নই। আমাদের সেনাবাহিনী চবিবশ ঘণ্টা সদা-প্রস্তুত হয়ে আছে যে কোনও হুমকির মোকাবিলায়। যদিও আমরা যুদ্ধবাজ নই।"

অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'বাক-যুদ্ধপরাধের' জন্য 'আত্মপক্ষ সমর্থন' করেছেন এদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, তাতে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে সেসময়ই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একান্ত ঘনিষ্ট সেই হাফিজ সঈদ একটি পাক টিভি চ্যানেলকে বলছেন, নয়াদিল্লী কথা বলা বন্ধ না করলে যে কোনও মূল্যে যুদ্ধে যাবে পাকিস্তান। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

## জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি-হানায় নিহত ৬৯৩ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২০ বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রায় সাতশো রাজনৈতিক নেতা-কর্মী খুনের ঘটনায় জড়িত রয়েছে জেহাদি জঙ্গিরা। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সংখ্যাটা কিছুটা হলেও কমেছে। এক প্রবীণ পুলিশ আধিকারিকের কথায়—"নিরাপত্তা পরিস্থিতির আগের তুলনায় উন্নতি হওয়ায় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর চলতি বছর (২০০৯-১০) জেহাদি হামলার ঘটনা খানিকটা কমেছে।" তবে এই উন্নতি যে 'সামান্য' তা স্বীকার করে নিচ্ছেন রাজ্যের পুলিশ-কর্তারা। রাজ্য অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের তথ্যানুসারে ২০০৯-এ শাসক দল ন্যাশানাল কনফারেন্সের চারজন নেতা মারা যান জঙ্গি-হামলায়। ২০০৮-এও ন্যাশানাল কনফারেন্স, কংগ্রেস এবং আওয়ামী ন্যাশানাল কনফারেন্সের পাঁচ নেতা নিহত হন জঙ্গিদের হাতে। এর পাশাপাশি পিওপিল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দুই শীর্ষস্থানীয় নেতাও মারা যান ওই বছর। সংশ্লিষ্ট সেনা আধিকারিকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, গত বিশ বছরে যে ৬৯৩ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা-কর্মী। এদের সংখ্যা ৪১৬। এছাড়াও পি ডি পি-র ৯৬ জন, কংগ্রেসের ৮৬ জন, সিপিএমের ১৬ জন, বিজেপি ও আওয়ামী লিগের ১৫ জন করে ও অন্যান্য দলের ন'জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জঙ্গি হানার মাসুল গুণেছেন। এরমধ্যে ২০০২ সালেই ১০১ জন রাজনৈতিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ২০০১ সালে ৭৬ জন, ২০০৪ সালে ৬২ জন, ১৯৯৬ সালে ৬১ জন ও ১৯৯৭-১৯৯৮-এ ৫৮ জন করে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।**

# আম আদমির কংগ্রেসী বুলি এবার অনেকটা স্তিমিত

এন সি দে

গত বছর ছিল লোকসভার নির্বাচনী বছর। স্বাভাবিকভাবেই গত বছর কংগ্রেসীদের মুখে সর্বদাই লেগে ছিল 'আম আদমি'র উন্নয়নের বুলি। গত বছরের বাজেটে 'আম আদমী' ও 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' (সকলের জন্য উন্নয়ন) কথাগুলি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছিল। এবারের বাজেটে 'আম-আদমি' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র দুইবার। 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' সম্পর্কে বলা হয়েছিল "আমাদের সমস্ত কর্মসূচী ও স্কীমের উদ্দেশ্য হবে 'আম আদমি'। এবারের বাজেটে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে বলেছেন, "এটা হলো বিশ্বাসের বিষয়"। তার মানে ওনার বিশ্বাস লোকে ওনাকে অবিশ্বাস করছেন। কারণ এক দিকে অর্থমন্ত্রী বলছেন, এবার আর্থিক ঘাটতি ৬.৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে আনা হবে ৫.৫ শতাংশে। এটা করা হবে যোজনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় কমিয়ে। অন্যদিকে তিনিই আবার সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় ৩৭ শতাংশ বাড়িয়ে করে দিয়েছেন ১,৩৭,৬৭৪ কোটি টাকা। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়ও অনুৎপাদক ব্যয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই এটি যোজনা বহির্ভূত ব্যয়। এছাড়াও রয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাধের লাউ মুসলমানদের সেবার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। এই ব্যয় ২০০৮-এ ছিল ১০০০ কোটি টাকা; '০৯-'১০-এ করা হয় ১৭৪০ কোটি টাকা আর এবার এক লাফে করা হল ২৬০০ কোটি টাকা। '০৮-'০৯-এ করা হয়েছিল নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার লক্ষ্যে। '০৯-'১০ ও '১০-'১১ সালের বাজেট বৃদ্ধি নির্বাচনী বৈতরণী পার করে দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে। মনে আছে নিশ্চয়ই গতবার মুসলিম এলাকা উন্নয়নে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৭৪ শতাংশ। এতে ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে ও কেরলের মালাপ্পুরমে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস গড়ার লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকা। এবারের বাজেটে আরও ৫০ শতাংশ বাড়ানো হলো সারা দেশে মুসলিম অধ্যুষিত ৯০টি জেলার বহুমুখী উন্নয়নের জন্য। ভারতমাতার কোনও এলাকা কোনও সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা ভাবে সংরক্ষিত ও চিহ্নিত হতে পারে না।

এইভাবে সামাজিক উন্নয়নের নামে কংগ্রেস-তৃণমূল সরকার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও সংহত করার লক্ষ্যে বাজেটকে ব্যবহার করছে। মুখে বলছে এবারের বাজেট থেকে শুরু হবে পর্যায়ক্রমে আর্থিক ঘাটতি কমানো। ২০১০-১১ আর্থিক বর্ষে আর্থিক ঘাটতি ৬.৯ শতাংশ থেকে নামিয়ে আনা হবে ৫.৫ শতাংশ-এ। ২০১১-১২ বর্ষে ঘাটতি নামিয়ে আনা হবে ৪.৮ শতাংশে আর ১২-১৩ বর্ষে হবে ৪.১ শতাংশ। কিন্তু গত বাজেটে পলিসি স্টেটমেন্টে তিনি বলেছিলেন ১২-১৩ বর্ষে এই ঘাটতি নামিয়ে আনা হবে ৩ শতাংশে। এসবই সরকারী পরিসংখ্যান। প্রকৃত ঘাটতি কোথায় দাঁড়াবে বলা মুশকিল। গতবারই বাজেটে মোট ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৪,১৪,০৪০ কোটি টাকা ছত্মড্রগ্ন। একই আর্থিক বছরে এই বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ একটি সরকারের পক্ষে নজিরবিহীন ঘটনা। এবারের বাজেটেও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৩,৮১,৪০৯ কোটি টাকা (BE)। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই লক্ষ্যমাত্রা তা আমাদের সকলেরই জানা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত গত কয়েকবছর ধরেই দুনিয়ার সর্বোচ্চ আর্থিক ঘাটতির দেশগুলোর মধ্যে সামনের দিকেই রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ঋণ একসঙ্গে করলে তা দাঁড়াবে GDP'-র ৬৮ শতাংশ। যা আগামী বাজেটের মধ্যে হবে বলে জানানো হয়েছে।

কিন্তু কিভাবে এই আর্থিক ঘাটতি কমবে তার সঠিক দিশা এই বাজেটে নেই। গত ভোটে কংগ্রেস স্লোগান দিয়েছিল—"কংগ্রেসের হাত আম-আদমীর সাথ", কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? এবারের বাজেটে মাত্র ১৩,৩৩৪ টাকা মাস মাইনের কর্মচারীদেরও আয়কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি। কিন্তু মাস মাইনে যার ৪১৬৬৭'-র উপরে অর্থাৎ বছরে ৫ লাখ টাকা, তাদের আয়কর ছাড় ২০,৬০০ টাকা, যার আয় বছরে ৭ লাখ টাকা তার ছাড় ৪১২০০ টাকা; ৮ লাখ টাকা আয়ে ছাড় ৫১৫০০ টাকা এইভাবে অর্থমন্ত্রী আয়করে ছাড় দিয়ে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি করেছে ২৬,০০০ কোটি টাকা। এই হলো 'আম আদমি'-র সাথের নমুনা। এছাড়াও দেশের বেসরকারী কোম্পানীগুলোর

*বাজেটের প্রতিবাদে কলকাতার ধর্মতলায় রাজ্য বিজেপির বিক্ষোভ। ছবি ঃ শিবু ঘোষ*

মুনাফার উপর সারচার্জ ১০ শতাংশ থেকে করা হয়েছে ৭.৫ শতাংশ। এখানেও আম আদমির চেয়ে আমীরদের প্রতিই তিনি দরদ দেখিয়ে সরকারের রাজস্ব বাড়িয়েছেন! আবার বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের আয় ১৫ লাখ টাকার মধ্যে তাদের আর ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে যাদের আয় ৬০ লাখ টাকার মধ্যে তাদেরও আয়ের অডিট করাতে হবে না। এই হলো আম আদ্‌মির সাথের নমুনা। নিম্ন আয়ের সরকারী কর্মচারীদের মাইনে সামনে দিয়ে বাড়িতে পিছন দিয়ে কেড়ে নিচ্ছেন।

বাঙ্গালী অর্থমন্ত্রী ভালো করেই জানেন যে আয়কর থেকে যতটুকু আয় হয় তার বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের সরকারী কর্মচারীদের পকেট কেটেই আসে। উচ্চ আয়যুক্ত পেশাদার ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা কখনই আয়কর ঠিকঠাক দেয় না। এই ক্ষেত্রে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সরকার কোনদিনই পূরণ করতে পারে না বা রাজনৈতিক কারণে করে না। ২০০৫-০৬ বর্ষে এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২,৬৫,০০০ কোটি টাকা, '০৬-'০৭ বর্ষে হয়েছিল ২,৮৯,০০০ কোটি;'০৭-'০৮-এ হয়েছিল ৩,৪১০০০ কোটি টাকা আর '০৮-'০৯-এ এই ক্ষতি হয়েছিল ৪,৫৯,০০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া গত বাজেটে ('০৯-'১০ বর্ষে) ব্যবসায়ীদের সরাসরি বিভিন্ন ট্যাক্স ছাড়— রিবেট এবং কনসেশন দিয়ে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৫,৪০,২৬৯ কোটি টাকা। এই ক্ষতির পরিমাণ মোট প্রকৃত ট্যাক্স সংগ্রহের ৮৬ শতাংশ। গত জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট মাত্র কয়েকটি তালিকাভুক্ত কোম্পানীতে হানা দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ হিসাব বহির্ভূত অর্থের সন্ধান পায়, তার পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকারও বেশী। এ রকম আরও কত কোম্পানী কত টাকা মেরে দিচ্ছে সরকারের তার ঠিকানা নেই। কংগ্রেস দল ও সরকার কী এসব জানে না? জানে বলেই কৃষির চেয়ে শিল্পের প্রতিই তাদের দরদ বেশি। কেননা নির্বাচনী তহবিলের উৎস তো কোম্পানীগুলির এই বিপুল হিসাব বহির্ভূত অর্থই।

এই কারণেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রমোটারদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া ক্রমশ বেড়েছে;অপরদিকে কৃষিতে ঋণ দেওয়া ক্রমশঃ কমেছে। পরিণামে কৃষি উন্নয়ন ২০০৩-০৪ বর্ষে সেখানে ছিল ১০ শতাংশ, ২০০৮-০৯-এ কমে দাঁড়িয়েছে ১.৬ শতাংশে;২০০৯-১০-এর শেষ দিকে তা কমে দাঁড়ায় ০.২ শতাংশে। প্রকৃত হিসাবে তা আরও কম। কৃষি উৎপাদনে কৃষকদের মধ্যে অনীহা জাগানো জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে। এবারের খরিফ শস্য উৎপাদনে ১৬ শতাংশ কম হওয়ার মধ্যে রয়েছে তার প্রমাণ।

নিজস্ব কৃষিকে ধবংস করে অন্য দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে দেশের বাজার বিদেশী দ্রব্যে ভরিয়ে তুলছে এই সরকার। মূল্যবৃদ্ধি রোখার সহজ পথ হিসাবে খাদ্য রপ্তানীর পথ নিচ্ছে। দেশের বাজারমূল্যকে বাড়ানোর চেষ্টা করছে, বাজেটে আরও অনেক নিন্দনীয়, জনবিরোধী, দেশবিরোধী দিক আছে। এই সল্প পরিসরে তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এক একটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা রইল।

# প্রণববাবুর বাজেটে গরীবদের কোনও সুখবর নেই

**তারক সাহা**

এবারের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আনন্দবাজারে একটা ছবি বেরিয়েছিল—ছবিটা হলো প্রার্থী প্রণববাবু করজোড়ে তাঁর গাড়ী থেকে হতদরিদ্র এক ভোটারের কাছে নিজের নির্বাচনীর কেন্দ্রে ভোট ভিক্ষা করছেন। ছবিটা এই প্রতিবেদককে বেশ নাড়া দিয়েছিল। ওই ক্ষণের জন্য হত-দরিদ্র মানুষটা—যার প্রতিদিন দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে কিনা সন্দেহ, সেই কিনা প্রণববাবুর ত্রাতা, ভগবান!

ঘটনাটার অবতারণা এইজন্যেই যে এইরকম বহু হতদরিদ্রের ভোটে জিতে প্রণববাবু দেশের অর্থমন্ত্রী। যাঁদের নিয়ে এই মন্ত্রীত্ব তাদের নিয়ে কী ভেবেছেন প্রণববাবু? এবারের বাজেটে প্রণববাবু যে কর প্রস্তাব করেছেন তাতে কি গরীবরা আদৌ লাভবান? ভোজ্য তেল বাদে সব কিছুর উৎপাদন শুল্কই তো বাড়িয়েছেন তিনি।

আমাদের দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিচিত্র ধরনের। বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষটি এদেশে রয়েছে, আবার আমাদের দেশেরই মানুষ বিশ্বের ধনী প্রতিযোগিতায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। এদেশের অর্ধেক মানুষ যাদের দৈনন্দিন খরচের সাধ্য ২০ টাকারও নীচে। আবার এমন মানুষও আছে যারা যখন যা খুশী কিনতে পারে। এমন বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সারা বিশ্বে বিরল। এরই মধ্যে পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিলেন আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে। প্রণববাবুদের যুক্তি বিশ্বে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। এই মহার্ঘ্য বাজারেও বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদেশ আমেরিকায় তেলের দাম এদেশের তেলের দামের প্রায় অর্ধেক। এদেশে পেট্রোলের দাম লিটার পিছু ৫১.১৫ টা. মার্কিনমুলুকে তা মাত্র ২৯ টাকা। দেশে চাকুরিজীবীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে চাকুরি করে যেখানে বছরের

পর বছর মালিকরা বেতনবৃদ্ধি করে না বা করলেও তা তাদের মর্জিমাফিক। প্রণববাবু এদের জন্যও কিছু করেন নি এবারের বাজেটে।

ইন্দিরা জমানায় সবুজ বিপ্লবের সুফল উত্তরভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে বার্ষিক ২.৫-৩ শতাংশ, খাদ্য উৎপাদন কমতে কমতে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১.৩ শতাংশে। এই বৈষম্য বাড়িয়ে দিয়েছে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য। এবারের বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রে খরচ বাড়িয়েছেন, বিশেষতঃ গঙ্গা বেশিনের উর্বর জমিতে হরিৎ ক্রান্তি সফল করতে। বরাদ্দ মাত্র চারশো কোটি। মুদ্রাস্ফীতির জমানায় এই গঙ্গা বেশিনের রাজ্যগুলি বিশেষত উত্তরপ্রদেশ-বিহার-পশ্চিমবঙ্গে এই বরাদ্দকৃত অর্থ নেহাৎ-ই অপ্রতুল।

প্রণববাবু এবারের আর্থিক সমীক্ষায় ৯ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি দেখিয়েছেন। মন্দার বাজারে এদেশে যে আর্থিক বৃদ্ধি ঘটেছে তার সিংহভাগের দাবিদার মোবাইল ফোন ব্যবহারের বাড়-বাড়ন্ত। মানুষের অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য যখন গগনচুম্বী তখন মোবাইল অপারেটর কোম্পানীগুলি প্রতিযোগিতার জমি দখলে 'এক পয়সার' দৌড়ে নেমেছে। একে যদি প্রণববাবু আর্থিকবৃদ্ধি-র সাফল্য হিসেবে দেখাতে চান তবে ভারতের আম-আদমীর ভবিষ্যৎ ভগবান ভরসায়!

প্রণববাবু স্বার্থ দেখেছেন সরকারি চাকুরে যাঁরা বর্তমানে সবচেয়ে সুরক্ষিত ও সংগঠিত ক্ষেত্রের চাকুরেদের। এই শ্রেণী ভারতীয় সমাজের ৯ শতাংশের অধিক নয়। প্রণববাবু এবারেও কর কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের পথে হাঁটলেন না। দেশে এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেখানে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা চারজনেই সংগঠিত ক্ষেত্রের চাকুরে। ধরা যাক্ স্ত্রী ও কন্যা দুজনেরই বার্ষিক আয় ১,৯০,০০০ এবং স্বামী ও পুত্রের বেতন প্রত্যেকেরই বার্ষিক ১,৬০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ওই পরিবারের চারজন সদস্যদের মোট বার্ষিক বেতন ৩,৮০,০০০৩,২০,০০০৭ লক্ষ টাকা। বাজেটে ওই ৭ লক্ষ টাকা বেবাক্ করশূন্য। অথচ এমন পরিবারও আছে যেখানে পরিবার কর্তার আয় সাকুল্যে ৩ লক্ষ টাকা এবং ওই কর্তাকে ৬ জনের

*(এরপর ৯ পাতায়)*

# মুসলিম তোষণের বাজেট

**অর্ণব নাগ**

একা সাচারে রক্ষা নেই, রঙ্গনাথ দোসর। যার নীট ফল, ২০১০-এর সাধারণ বাজেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি। এর সঙ্গে দু'টি প্রাসঙ্গিক তথ্যের সংযোজন একান্তভাবেই প্রয়োজন। সংখ্যালঘু বলতে মূলত মুসলিমদেরই বোঝানো হচ্ছে। ভারতে যাদের জনসংখ্যা ১৫ কোটি। এত বেশি সংখ্যক মুসলমান একমাত্র ইন্দোনেশিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই। ১১০ কোটি মানুষের ভারতবর্ষে মুসলমানদের অস্তিত্বই ১৪ শতাংশ। দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যটা হলো, এই ব্যয়-বরাদ্দের পুরোটাই সরকারি কোষাগার (fiscal) থেকে আসবে। যে কোষাগারে অর্থের যোগান হয় সাধারণ মানুষের করের টাকায়।

তাঁর বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এনিয়ে কি বলেছেন সেটা সর্বাগ্রে দেখে নেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ২০১০-১১ সালের বাজেটে বরাদ্দ ১,৭৪০ কোটি টাকা (এটাই গত বছরে সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল) থেকে বাড়িয়ে ২৬০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।" এই নিয়ে তাঁর পরবর্তী 'বিশ্লেষণ'টা আরও মারাত্মক। তাঁর মন্তব্য—"আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সংসদের সকল সদস্যকে অবগত করছি যে চলতি আর্থিক বর্ষে অগ্রণী ক্ষেত্র (প্রায়োরিটি সেক্টর)-গুলিতে সংখ্যালঘুদের অন্তত ১৫ শতাংশ ঋণদানের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করার খুব কাছাকাছি জায়গায় আমরা চলে এসেছি।"

কথাটার তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আর এই প্রশ্নের পাশাপাশি এর যে উত্তর অবধারিতভাবেই চলে আসছে তা সর্বভারতীয় সংখ্যালঘু তোষণ প্রতিযোগিতায় কংগ্রেসকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের তুলনায় বেশ কয়েক কদম এগিয়ে দেবে—একথা বলাই বাহুল্য! আলোচ্য নিবন্ধে সেই প্রশ্ন ও উত্তরেরই সন্ধান করা যাক্ আপাতত।

২০০৬-এর নভেম্বরে সাচার কমিটির রিপোর্টে মুসলমানদের দুরবস্থা নিয়ে যে তথ্য ফাঁস হয়, তাতে বলা হয়েছিল—মুসলমানদের বর্তমান দারিদ্র্য-হার ৩১ শতাংশ (সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই হার ২২ শতাংশ) এবং মুসলমান স্নাতকদের মধ্যে ১৫ শতাংশই বেকার। সারা ভারতে এইরকম শিক্ষিত বেকারদের হার ছিল তখন এর প্রায় অর্ধেক। সাচার কমিটির রিপোর্টে প্রকাশিত 'মুসলিমদের বারোমাস্যা'র ভেতরে আরও ছিল সিভিল সার্ভিস, রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারি চাকরি, সেনাবাহিনী এবং আইন সংক্রান্ত চাকরি মিলিয়ে মুসলমান নিয়োগ প্রায় ৫ শতাংশের মতন। অথচ দেশের জনসংখ্যার নিরীখে তাঁরা প্রায় ১৪ শতাংশ।

*২০০৭ সালে সরকার ৯০টি মুসলিম ঘনবসতিপূর্ণ জেলা (মুসলিম কনসেনট্রেশন ডিস্ট্রিক্ট বা এম সি ডি)-কে চিহ্নিত করলেন। দেহের সব রক্ত মুখে জমা করে মুসলিম সৌন্দর্য্যায়নের একটি কষ্টকল্পিত প্রয়াস চালানো হলো। খালি এই ৯০টি জেলাতেই উন্নতমানের গৃহ, শৌচালয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ঋণ ও কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখানো উচ্চাকাঙ্ক্ষী মাল্টি-সেক্টোরাল ডেভলপমেন্ট প্ল্যান (এম এস ডি পি) চালু*

এসব তথ্য-পরিসংখ্যান হাজির করে সাচার সাহেব দাবি করলেন—মুসলমানদের উন্নতিতে সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া একান্তভাবেই জরুরি।

এই অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানটা একারণেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ শুধুমাত্র এর ওপর ভিত্তি করেই কেন্দ্রিয় সরকার ২০০৬ সালেই একটি নতুন মন্ত্রকের সূচনা করলেন যার নাম দেওয়া হলো সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক। যদিও সংবিধান বাঁচিয়ে এর নামের সঙ্গে সংখ্যালঘু শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেবলমাত্র মুসলিমদের পশ্চাদপদতা ও দারিদ্রের কারণ অনুসন্ধান ও তার দূরীকরণেই বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য ধার্য করা হয়েছিল অতিরিক্ত ১৭৫৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে এম এস ডি পি একাই তুলে নিল ৮৮৯.৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ মন্ত্রকের বাজেট বহির্ভূত খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রায় ৫৬ শতাংশই ওই ৯০টি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে বলে সরকারি তরফে জানানো হলো।

কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটাই যে একটা হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তা পরিষ্কার করে দিল সি বি জি এ (সেন্টার ফর বাজেট অ্যান্ড গর্ভন্যান্স অ্যাকাউন্টেবিলিটি)। সিবিজিএ তাদের প্রতিবেদনে প্রসঙ্গত জানাল, ৯০টি মুসলিম ঘনবসতিপূর্ণ জেলার মধ্যে প্রায় ৭৪টিতে উন্নয়নের জন্য অর্থ খরচের (পড়ুন অপচয়ের) বিস্তৃত নমুনা পেশ করেছিল সরকার। তাতে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ধার্য করা হয়েছিল ১৫৬২ কোটি টাকা। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৭৭ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে কেন্দ্র। অর্থাৎ মোট আর্থিক বরাদ্দের মাত্র পাঁচ শতাংশ খরচ করা গেছে। আরও মজার কথা হলো, একাদশ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০৭-১২) অনুযায়ী মুসলিম অধ্যুষিত ওই ৯০টি গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ২৭৫০ কোটি টাকা ধার্য করা হলেও এখনও অবধি তার অর্ধেক সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও সেই ধার্যমাত্রার মাত্র ২.৮ শতাংশ টাকা খরচ করা গিয়েছে।

মন্ত্রকের তথ্য-পরিসংখ্যান নজরদারি কেন্দ্র (ডাটা মনিটারিং ইউনিট) ওই ৯০টি গ্রামের মধ্যে ৪৪টিতে ঘুরে এসে জানিয়েছে ২০০৯-এর ডিসেম্বর অবধি আগের তুলনায় বরাদ্দ-ব্যয়ের পরিস্থিতি সামান্য উন্নতি করলেও পুরো আর্থিক বরাদ্দের মাত্র ১৭ শতাংশ তহবিল হাতে পাওয়া যাচ্ছে অধিকাংশ জেলাগুলিতেই। প্রসঙ্গত, অধিকাংশ রাজ্যেই ২০০৯-১০-এর তহবিল উন্মোচিত হয়েছে '০৯-এর ডিসেম্বর মাসে।

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু-বিষয়ক মন্ত্রক সাম্প্রতিক আর্থিক বাজেটের আগে তাদের খসড়া প্রতিবেদনে জানিয়েছে ইন্দিরা আবাস যোজনায় মুসলিম পরিবারগুলোর জন্য ২ লক্ষ ৫ হাজার ২৬০টি বাড়ির পরিবর্তে ৩,২০১টি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। একইসাথে ১৪,০২০টি হ্যান্ডপাম্প বসানোর কথা থাকলেও এখন অবধি মাত্র ১৫২৩টি হ্যান্ডপাম্প বসানো হয়েছে। ১৭১৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র লক্ষ্য থাকলেও মাত্র ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেই লক্ষ্যমাত্রার বহু-যোজন দূরে থামতে হয়েছে সরকারকে। ১৮ হাজার ৯৭০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বদলে ২০টি কেন্দ্র স্থাপন করেই ক্ষান্ত দিয়েছে সরকার।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের এজাতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান দেখে তড়িঘড়ি প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর বাজেটে মুসলমানদের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ গতবারের তুলনায় ৮৬০ কোটি টাকা বাড়িয়েছেন। উপরন্তু বড়ধরনের আর্থিক-কেলেঙ্কারী না হলে নিবন্ধে আলোচিত বহু কোটি টাকা এখনও মুসলমান তোষণের অপেক্ষায় মুক্তির দিন গুনছে। অন্যদিকে বাজেট বহির্ভূত বিভিন্ন খাতে 'সংখ্যালঘু' (পড়ুন মুসলিমদের)-দের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ তো আছেই। এই তিনটে বিন্দুকে এক করেই এবারে বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। সুতরাং এই বাজেটে কেন্দ্রিয় সরকারের স্লোগান—তোরা যে যা বলিস ভাই, বাজেটে মুসলিম বরাদ্দ চাই-ই (একটু না হয় বেশিই চাইলাম! সাচারের পরে রঙ্গ নাথের ধাক্কাটাও তো সামলাতে হবে, না কি?)!

# গরীবদের কোনও সুখবর নেই

*(৮ পাতার পর)*

ভরণপোষণের দায় বয়ে বেড়াতে হয় এবং ওই ৩ লক্ষ টাকার ওপর তাকে কর দিতে হবে। প্রথম পরিবারের হাতে অঢেল টাকা খরচ করার জন্য। দ্বিতীয় পরিবারের হাতে টাকাই নেই বাড়তি খরচের জন্য এই দুর্মূল্যের বাজারে। এটাই হলো প্রণববাবুর ষ্টিমুলাস প্যাকেজ। এক ধরনের পরিবার আছে যারা বড় শহরে দু-তিনটে-চারটে ফ্ল্যাটের বাড়ীর মালিক। আবার আরেক ধরনের পরিবার আছে যাদের মাথার ওপরে ছাদ নেই।

প্রণববাবুর এই ষ্টিমুলাস প্যাকেজের মাসুল গুণতে হচ্ছে সমাজের দরিদ্রতম মানুষটিকে।

এবারের বাজেটে প্রণববাবু সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। ১লা এপ্রিল থেকে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের একটা অনুচ্ছেদ সংযোজন হতে চলেছে—তা হলো ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুর শিক্ষাকে আবশ্যিক করার গ্যারান্টি। সাক্ষরতা ও স্কুলশিক্ষায় মোট খরচ ৩৯,৫৫৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪৭,৭৭৩ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থ কতটা মানুষের কাজে আসবে, কত শিশু সাক্ষর হবে তা নিয়ে একটা সংশয় থেকে যায়। কারণ এ রাজ্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, এরাজ্যে গ্রামে-গঞ্জে এমনকী খোদ কলকাতার বুকে বহু স্কুল হয় অর্থের অভাবে বন্ধ অথবা পড়ুয়াদের অভাবে স্কুলগুলি ধুঁকছে।

সরকার যখন প্রত্যক্ষ কর আদায়ে ব্যর্থ হয়, তখনই হাত পড়ে পরোক্ষ করে। প্রত্যক্ষ কর শুধুমাত্র পয়সাওয়ালারা প্রদান করে, কিন্তু পরোক্ষ কর দেয় সমাজে যারা রোজ ২০ টাকাও খরচ করতে পারে না তারাও। দেড় দশক আগেও 'পরিষেবা কর' এদেশে অপরিচিত ছিল। কিন্তু এই পরিষেবা কর ৫ শতাংশ থেকে বাড়তে বাড়তে ১০.২ শতাংশে পৌঁছেছে। সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষ যারা তাদের কাজের সুবিধার জন্য মোবাইল ব্যবহার করে তাদেরও পরিষেবা কর দিতে হচ্ছে। এবারেও প্রণববাবু পরিষেবা করের পরিধি বাড়িয়েছেন। রেলসেবায় পরিষেবা কর বসিয়েছেন। যার ফলে পণ্য পরিবহণের খরচ বেড়ে যাবে। রেল বাজেটে মমতা যখন ওয়াগন পিছু ১০০ টাকা ভাড়া কমিয়েছেন সেখানে পরিষেবা কর বসানোয় তা অবধারিতভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে। সরকার ১ টাকা কর বসালে ব্যবসায়ীরা চারটাকা দাম বাড়িয়ে তা উসুল করে, এমনটাই এদেশের দস্তুর। আর সরকার যখন ১ টাকা কর কমায় তখন কিন্তু ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের দাম কমায় না।

সুতরাং এবারের বাজেট দেখে তো মনে হয় না প্রণববাবু আম আদমিদের জন্য কিছু করেছেন। ষ্টিমুলাস প্যাকেজের নামে প্রণববাবু সরকারি রাজকোষে যে বিপুল ঘাটতি ব্যবস্থা করেছিলেন গতবারের বাজেটে সেই ঘাটতি মেটাতে হবে সেই দেশের দরিদ্রতম মানুষটিকে যার কাছে গত লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রণববাবু করজোড়ে ভোট ভিক্ষা করেছিলেন। এটাই বাস্তব, বাকিটা কেবল গিমিক।

# মুসলিম সংরক্ষণ

মুসলিম সংরক্ষণ সম্পর্কে দু-চারটি কথা তুলে ধরতে চাই।

১। আমাদের ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু বর্তমানে সরকার নিজেই ভোটের জন্য ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের মাধ্যমে বিভেদ তৈরি করে জনগণকে ভাগ করছে। এক্ষেত্রে কোথায় গেল "ধর্মনিরপেক্ষতা"?

২। ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলমানরা তাদের সমস্ত অধিকার দেশ ভাগের মাধ্যমে আদায় করেছে। তাহলে ভারতে তাদের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি শুধু প্রচারেই ধর্মনিরপেক্ষ; দেশ বা দেশের ভবিষ্যৎ তাদের কাছে গৌণ। এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির জন্যই ১৯৪৭-এ দেশ ভাগ হয় এবং আমরা আজও তার ফল ভোগ করছি।

৩। ভোটের জন্য কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস দল স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই মুসলিম তোষণে ব্যস্ত। এদের কাছে দেশ নয়, ক্ষমতাই বড়।

৪। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কি শুধু মুসলিম তোষণ আর মুসলমানদের সংরক্ষণ? ভারতবর্ষে কেন মুসলমানরা অধিক অধিকার পাবে? বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে কি হিন্দুদের জন্য আলাদা করে কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় বা কোনও বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়? অমুসলিমদের এখনই প্রতিবাদ করা উচিৎ। মুসলিম বা তাদের তাঁবেদারদের ভোটের অধিকার ছিনিয়ে নিলে আর তোষণ চলবে না। আইন দেশের জন্য, আইনের জন্য দেশ নয়। ভারতবর্ষকে পুনরায় বিভাজনের থেকে বাঁচাতে হলে সমস্ত ভারতীয়কে এখনই এই 'মুসলিম সংরক্ষণ'-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

—এ. কে. চ্যাটার্জী, সন্তোষপুর।

# ভুবনতীর্থ

গত কয়েকদিন স্থানীয় সংবাদপত্রে অসমের ভুবনতীর্থ সম্বন্ধে নানা কথা লেখা হয়েছে। বরাক উপত্যকায় এই তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে শ্রদ্ধা দেখা যাচ্ছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। লাখো লোকের এই শ্রদ্ধাকেন্দ্রে যাতায়াতের রাস্তা অবিলম্বে শক্তপোক্ত ভাবে বানানো প্রয়োজন যেটা মন্দির বা মেলা কমিটির দ্বারা সম্ভব নয়—রাজ্য তথা কেন্দ্র সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদ্যোগের প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ জম্মুর মাতা বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের রাস্তা জগমোহন গভর্নর থাকাকালীন সুন্দরভাবে রাস্তা নির্মাণ তথা বিভিন্ন স্থানে অপেক্ষাগার ও পানীয় জল এবং বিদ্যুতের সু-বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এখানেও সেটা খুব কঠিন নয়। মন্দিরের পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করে জল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা, শৌচালয় তথা অস্থায়ী বিশ্রামাগার করা যেতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন তীর্থযাত্রায় যেমন লঙ্গরের ব্যবস্থা থাকে, এখানেও আবেদন, সুষ্ঠু ব্যবস্থা করলে শ্রদ্ধালুব্যক্তিবর্গ এই ব্যাপারে অবশ্যই এগিয়ে আসবেন। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। চিকিৎসা ব্যবস্থাও অত্যন্ত জরুরী। একটি সেবা সংস্থা তাদের স্বল্প সামর্থ্য নিয়ে যেটুকু করেছেন অনেকেই তার ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন। কিছু সংখ্যক সাধু (?) নেশাগ্রস্ত হয়ে যা আচরণ করেন সেটা মনকে পীড়া দেয়। এছাড়া কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা বেশীর ভাগই নেশাগ্রস্ত হয়ে যেভাবে ওঠা নামা করে তার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। মন্দিরের আশেপাশে তথা গোটা পথেই যত্রতত্র মদের বোতল এবং তথাকথিত সাধুদের খোলাখুলি গাঁজা সেবন বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে। শিবরাত্রি ছাড়াও বছরে আরও কয়েকবার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ভুবন পাহাড়ে যান। এটা নিঃসন্দেহে ভুবন বাবার মহিমা বলা যায়। পুষ্করিণীর জল কাদা সর্বস্ব হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে কোনও প্রকার রোগের খবর নেই, এটাও মহিমাই বলতে হয়।

—হরিসাধন কোঙার, শ্রীগৌরী, করিমগঞ্জ, অসম।

## চিঠিপত্র

# সংরক্ষণ মুসলমান সমাজকে বাঁচাতে পারবে না

**জয়রাম মণ্ডল।।** গত ৩৩ বছরের শাসনে যাদের কথা মনে ছিল না আজ হঠাৎ করে সেই মুসলিমদের সংরক্ষণের কথা মনে পড়ে গেল। নিজেদের আখের গোছানোই যাদের মূলমন্ত্র তাদের মুখে সংরক্ষণ? এটা খুড়োর কল ছাড়া আর কি? জনগণের মাথায় ডান্ডা বেঁধে সামনে দড়ি দিয়ে জিলাপি ঝুলিয়ে দেওয়া।

মুসলিমদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ২০১১ সালে ভোট। ভোটকে মাথায় রেখে এত কিছু কাণ্ড। বামদুর্গের এই কৌশল নতুন নয়। বিগত ভোটে রেজাল্টেই প্রমাণ করছে বামরাজত্বের ধস। তাও আবার বামশাসনের নায়কের দেহান্ত। জ্যোতিবাবু চলে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি ম্রিয়মান। তাই ভোটে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা। মুসলিম ভোটও বিগত নির্বাচনগুলিতে হ্রাস পেয়েছে। নয়া কৌশল অবলম্বন ছাড়া আর উপায় নেই। তাই একমাত্র পথ সংরক্ষণনীতি। সংরক্ষণই বামদুর্গকে রক্ষার পথ। যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতাকে ধরে রাখা। ক্ষমতার স্বাদ যারা একবার পেয়েছে তারা যেভাবেই হোক সিংহাসন দখল রাখতে চায়। তাতে দেশ চুলোয় যাক। পার্টি বাঁচলেই দেশ বাঁচবে। পার্টিই সর্বেসর্বা। দলের ধর্ম বড় ধর্ম। তাই দলকে বাঁচাতে বামদুর্গের একসাথে সকলেরই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত।

সংরক্ষণ নীতি দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দ্বিচারিতার জন্য সমস্ত বর্ণের মানুষ আজ ক্ষিপ্ত। সরকারের এই পদক্ষেপ মানুষকে বিভক্ত করে তুলবে। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বাড়াবে, শত্রুতা বাড়বে বই কমবে না। আন্দোলন হবে। সরকারের সাথে জনগণের লড়াই হবে। খণ্ডযুদ্ধ ও নিশ্চিত। সবশেষে কিছু মানুষের ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবীও। কোনও সরকার রুখতে পারবে না এই ক্ষয়ক্ষতির পরিণাম। সরকারের এই সর্বনাশা পথকে প্রত্যাহার করা উচিত। মানুষের দুঃখদুর্দশার মাপকাঠি সংরক্ষণ নীতি নয়। অর্থনৈতিক বিচারে মানুষের মধ্যে সমতা আনা দরকার। তাহলে দেশের সমস্ত মানুষ সাধুবাদ জানাবে। কেউ বিরোধিতা করবে না। অথচ মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে। আমরা সেই পথে যাচ্ছি না কেন? দেশের সমস্ত জায়গায় অসন্তোষের পাহাড় তৈরি হয়েছে। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে। বাংলার কথাই ধরুন—পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত একই চিত্র। পাশেই সিকিম রাজ্য। সিকিমের ডেভলপমেন্টের প্রভাব দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় পড়ছে। দীর্ঘদিন পাহাড়ের মানুষ অবহেলিত। ফলে তারা আলাদা রাজ্য দাবিদার। কামতাপুরিরা কামতাপুর রাজ্যের গঠনে উদগ্রীব। গ্রেটার কুচবিহার কোচবিহার রাজ্য চায়। আদিবাসী বিকাশ পরিষদ তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে। আমরা যারা বাঙালি তারাও আলাদা বাংলা চাইছি। মুসলমানরা তো ইতিমধ্যেই ভারতকে ভেঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে নিয়েছে। পশ্চিমবাংলাকে টুকরো করার আবার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা সবাই বঞ্চিত। সেই কারণে আজ এক চরম বিশৃঙ্খলার বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। এই পরিবেশের জন্য দায়ী বামফ্রন্ট সরকার। আগামী দিনে এর মাসুল দিতে হবে সবাইকে।

মুসলমানরা অনগ্রসর একথা সরকারের বক্তব্য। কিন্তু একথা সকলের জানা মুসলিম অনুন্নয়নের জন্য মুসলিমরাই দায়ী। গত ৩৩ বছরে বামফ্রন্ট সরকার মুসলিমদের উন্নয়ন করতে পারেনি। আজ ১০ শতাংশ সংরক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটে যাবে! রাজীব গান্ধী নিজেই বলেছিলেন—১ টাকার মধ্যে মাত্র ২৫ পয়সা জনগণের হাতে পৌঁছাতে পারে। বাকি ৭৫ পয়সা ক্যাডারদের পকেটস্থ হবে একথা আমজনতা জানে।

শুধু তাই নয়, মুসলমান সমাজ নিজেই নিজেদের অন্ধকূপে নিমজ্জিত রেখেছে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তৈরির মানসিকতা তাদের নেই। তারা চায়ও না। বেশী শিক্ষায় শিক্ষিত করা হলে মৌলবাদ সমাজ থেকে দূরে সরে যাবে। মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখুন তাদের উচ্চ শিক্ষিত কতজন। হাতে গোণা যায়। উচ্চশিক্ষিত মহিলারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখবে। মুসলিম মহিলারা মুসলমান সমাজের কাছে ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের সন্তানের জন্মহার বেশি। তারা বলছে আমাদের বিবির সংখ্যাও বেশী চাই। এক স্ত্রীতে তারা বিশ্বাস করে না। তাদের ক্ষেত্রে শরিয়ত আইন প্রযোজ্য। সরকারি আইন তারা মানতে রাজি নয়। তারা নিজেদের মতো তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কাশ্মীরের কথাই ধরুন—ভারত সরকারের আইন সেখানে চলে না কেন? এক দেশে আলাদা আলাদা আইন একমাত্র কাশ্মীরে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই তারা আলাদা রাষ্ট্রের দাবী তুলবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়—ইসলাম রাষ্ট্রের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। সারা দুনিয়াকে তারা ইসলামের রাজ্যে পরিণত করতে চায়। এই যাদের প্রয়াস তারা মূলসমাজের স্রোতে কখনওই ফিরে আসতে পারে না। আর আসবেই বা কেন? এই দুরভিসন্ধি আজ আমাদের নেতারা বুঝেও অবুঝ। কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের কেবল ভোটের কথা চিন্তা। যদিও এর পরিণাম নেতারা জানে। রেজ্জাকসাহেব ভূমি সংস্কার মন্ত্রী। তিনি সারা বাংলার মন্ত্রী না মুসলিমদের মন্ত্রী? মুসলমানভাইদের ভোটে অন্য কেউ থাবা বসাতে না পারে তার কথা মাথায় রেখেই বামফ্রন্টকে গালাগালি করে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, আগামী দিনে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য নিয়ে কাজে মন দিয়েছেন। যাতে দিদির কোর্টে বল না যায়। গোল যদি দিতেই হয় বামেরাই দেবে। দিদি যাতে ফিরে না আসতে পারে। ২০১১ সালে ভোট। বামফ্রন্টের জোট। দিদি না বুদ্ধ?

## জনমত

# স্কুল পরিচালনায় বন্ধ হোক দলাদলি

**বিদ্যাধর ভট্টাচার্য।।** সম্প্রতি স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচন ঘিরে রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে এক একটা অঞ্চল। স্কুল নির্বাচনকে ঘিরে গণ্ডগোলে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, গণ্ডগোল থামাতে র‍্যাফ নামাতে হচ্ছে। স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলের পরিচালন সমিতিতে বিষাক্ত রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা আজ ধ্বংসের পথে। প্রাথমিকভাবে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে থাকার কথা এলাকার শিক্ষানুরাগী অভিভাবকদের। কিন্তু ১৯৭৭ সালের পর থেকে বাম আমলে স্কুলগুলিও হয়ে পড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। দীর্ঘ বামশাসনে সামান্যতম স্থানও যখন দলীয় ভাবনার বাইরে থাকতে পারেনি তখন স্কুল পরিচালনায় দলীয় রঙ-ই দেখা ছাড়া উপায় কি! এভাবেই বিদ্যালয়গুলিতে ক্ষমতার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত আরম্ভ হয়। চালু হয় স্কুলে স্কুলে অলিখিত সংবিধান। সেক্রেটারির হুকুমে বিরোধী দলের বনধে আসতে না পারলে সি এল কাটা যাবে আর বামফ্রন্টের বনধে স্পেশাল লিভ। একসময় বামবিরোধী মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত যুবকদের স্কুলে চাকরি পাওয়া আর লটারির পুরস্কার পাওয়া প্রায় সমান ছিল। ম্যানেজিং কমিটি বেছে বেছে দলীয় সমর্থকদের পুত্র কন্যাদেরই চাকরি দিয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করার পর অবস্থার কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়। অবশ্য ম্যানেজিং কমিটির দাপট তাতেও কমেনি। বেয়াড়া শিক্ষককে টাইট দিতে ম্যানেজিং কমিটি সফল হয়েছে প্রায় সবক্ষেত্রেই। দু'একজন অবশ্য বেঁচেও গিয়েছেন। কংগ্রেসী আমলে স্কুল শিক্ষকতা পেশা হিসেবে ততটা লোভনীয় ছিল না, অল্প পরিশ্রমেই এই চাকরিতে ঢোকা যেত, বিনিময়ে ম্যানেজিং কমিটি দাবি করতেন নিরঙ্কুশ আনুগত্য। আজ স্কুলের চাকরি লোভনীয় হয়েছে আর দলীয় আনুগত্য বাধ্যতামূলক হয়েছে।

শিক্ষকতা একটি মিশন হিসেবেই এতদিন বিবেচিত হয়ে আসছিল, এখন আরম্ভ হয়েছে 'প্রফেশন'। অন্য পাঁচটা দায়িত্বপূর্ণ পেশার মতো শিক্ষকতাও একটা পেশা মাত্র। স্কুলের উন্নয়ন, ছাত্রদের যোগ্য হিসেবে তৈরি করা তাই আর শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আজ তাই আর মধুর নয়। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শিক্ষক এখন তৃণমূলী ঘরের ছেলেটিকে কিভাবে হেনস্থা করবে সে ব্যাপারে সচেষ্ট। শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি আজ নিত্যদিনের ঘটনা। বিরোধী মনোভাবাপন্ন শিক্ষককে প্যাঁচে ফেলতে ম্যানেজিং কমিটি থেকে ডি. আই পর্যন্ত সচেষ্ট। এভাবে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব? অথচ এই ম্যানেজিং কমিটির গঠনতন্ত্রে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনা গেলে পরিস্থিতি অনুকূল হতে পারতো। শিক্ষার প্রাঙ্গণে শিক্ষিত ব্যক্তিরা থাকবেন এটাই কাম্য। কিন্তু সেখানে এখন টিপ সই করতে জানা সভাপতি আর ক্লাস ফাইভ পাশ সেক্রেটারিরা রাজনীতির জোরে লাঠি ঘোরাতে ব্যস্ত। ছেলেমেয়েদের ক্লাসের পর ক্লাস অ্যাডমিশন ও প্রোমোশনকে ঘিরেই তাঁদের যাবতীয় তৎপরতা আবর্তিত হতে থাকে। যোগ্যতার ভিত্তিতে কতজন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হবে বা টেস্ট পরীক্ষায় কতজন ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক দিতে পাঠানো হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী শিক্ষকরা হলেও সেখানে ম্যানেজিং কমিটি মাতববরি করে থাকেন।

বস্তুত রাজনৈতিক দলাদলির জন্যই আজ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি ধুঁকছে। পরিচালন সমিতি ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সম্পর্কও মধুর নয়—এভাবে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে শিক্ষাপ্রাঙ্গণে সকলের সম্পর্ককে সহায়তামূলক ও যুক্তিপূর্ণ ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করাতে পারলে তবেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ কলুষিত মুক্ত হবে। অস্বীকার করার উপায় নেই আজ প্রায় সমস্ত শিক্ষক সমাজই দলীয় মনোভাবাপন্ন। কিন্তু তার প্রতিফলন যাতে বিদ্যালয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটিকে সচেষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু সেখানেই যদি গলদ থাকে অর্থাৎ ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরাই যদি দলীয়সমর্থক হন তাহলে স্কুল শিক্ষার উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? তাই প্রস্তাব স্কুল পরিচালনায় রাজনীতি নয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই কেবল ক্ষমতায় আসুন। দলীয় ক্যাডারেরা রাজনীতিকে আলোকিত করতে পারেন কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাকে নয়।

# হিন্দু নববর্ষের শুভারম্ভ বর্ষপ্রতিপদা

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

বর্ষপ্রতিপদা—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদতিথি, বছরের প্রথমদিন। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বর্ষ-গণনা পদ্ধতি। পৃথিবীতে অনেক প্রকার বর্ষগণনার প্রচলন আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত হল "খৃস্টাব্দ"। যদিও এই বর্ষগণনা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫৪৫ সালের পূর্বে এই মতে বছর শুরু হোত ২৫ মার্চ থেকে এবং পরে ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়। সেই দিক থেকে চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথি থেকে বর্ষগণনার প্রচলন অনেক প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য। এর কারণ হল এই বর্ষ বা কাল গণনা পদ্ধতি সূর্য সিদ্ধান্ত অনুসারী—অর্থাৎ এই কাল গণনার ভিত্তি বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান। সেইজন্য অন্যান্য কাল গণনা থেকে বর্ষপ্রতিপদ কাল গণনা এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বহন করে।

হিন্দু গ্রন্থ সাক্ষ্য অনুসারে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে (পক্ষের প্রথম দিন) সূর্য্য উদয়ের সময় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই সৃষ্টি রচনা করেন।

"চৈত্রমাসি জগৎব্রহ্মা সসর্জ প্রথমহনি।
শুক্লপক্ষে সমগ্রে তু সদা সূর্য্যোদয়ে সতি"
(ব্রহ্মপুরাণ)

হিন্দু সমাজে যুগ-যুগ ধরে চৈত্র শুক্ল-প্রতিপদের দিন থেকে বর্ষগণনার প্রচলন আছে। হিন্দু নববর্ষের শুভারম্ভ হিসেবে এই তিথিটিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় লোকাচার অনুসারে উৎসব পালিত হয়ে থাকে। পৌরানিক (অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা) এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বিভিন্ন ঘটনা এই দিনটি সংঘটিত হয়েছিল বলে জানা যায়। বলা হয় পৃথিবীর সমগ্র জ্ঞানের ভান্ডার চার বেদে বিধৃত আছে (আধুনিক গবেষণা এখন অবধি এই দাবী আংশিক ভাবে সমর্থন করে)। এই চার-বেদকে মানবজাতির মঙ্গলার্থে রক্ষা করার জন্য শ্রীভগবান এই দিন (রেবতী নক্ষত্রের বিষকুম্ভ যোগে) মৎস্য রূপ (মৎস্যাবতার) ধারণ করেন।

আবহমানকাল ধরে যে মহাপুরুষ ভারতীয় জনমানসে অতীব শ্রদ্ধাষ্পদ সেই মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক এইদিনে হয়েছিল। মা দুর্গার উপাসনা "নবদুর্গা" এই দিন থেকে শুরু হয়।

অন্যতম প্রাতঃস্মরণীয় সমাজ সংস্কারক এবং সংরক্ষক সন্ত ঝুলে লাল এবং দ্বিতীয় শিখ গুরু অঙ্গদের জন্ম তিথি এইদিনটি।

হিন্দু সমাজকে সনাতন মূল্যবোধে উজ্জীবত করার লক্ষ্যে মহর্ষি দয়ানন্দ এই প্রতিপদ তিথিতে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিগত শতাব্দীর (বিংশ) অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা (নাগপুর, ১৯২৫)। এই সংগঠনটি সারাবিশ্বে এই জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। একটি বিশেষ পদ্ধতির (শাখাপদ্ধতি) সহায়ে সমগ্র হিন্দু সমাজ, হিন্দুজাতিকে সংগঠিত করার মাধ্যমে স্বদেশ ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করাই এই সংগঠনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এক কথায় কবির আশা "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" এবং শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাই এই সংস্থার ধ্যেয়। এই সংস্থাটি বর্তমানে সারাবিশ্বের সমাজতত্ত্ববিদ এবং গবেষকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এর অভিনব সংগঠন শৈলীর সাফল্যের জন্য।

পরম্পরা

এহেন প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপক ডাঃ কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার এই তিথিতেই (১৮৮৯ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চিন্তন এবং কৃতি লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বদেশ হিতৈষণার প্রেরণা স্বরূপ।

এই বছর ২০১০ (খৃস্টাব্দ) বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সংবতের ২০৬৭ বর্ষের শুরু এবং যুগাব্দ ৫১১২-র শুরু।

এই বিশেষ তিথিটি আমাদের দেশ ও সমাজের বিভিন্ন ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার কারণে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গত একদশক আগে সারা পৃথিবীতে তৃতীয় সহস্রাব্দের সূত্রপাত নিয়ে যে বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, যে বিশাল উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল তা আজও অনেকের মনে আছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষও এ বিষয়ে পিছিয়ে ছিলনা। এই উৎসব, উৎসাহের কারণছিল পৃথিবী দুইটি সহস্রাব্দ অতিক্রম করে তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রবেশ করল খৃষ্টাব্দের হিসাবে। অথচ আমরা ভারতবাসীরা শুধু যুগাব্দ-এর হিসাবেই ৫টি-সহস্রাব্দ পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু নিজেদের ইতিহাস না জানা থাকায় আমরা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকে মাতামাতি করে আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা দেখালাম। নিজের দেশ, জাতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, পরম্পরা ইত্যাদির বিষয়ে অজ্ঞ থাকা আত্মহত্যার সামিল—তাই আগামী ১লা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৪১৬ মঙ্গলবার (১৬ মার্চ ২০১০ খৃঃ) বর্ষপ্রতিপদ তিথি হোক আমাদের শপথ গ্রহণের পুণ্য দিন। আমাদের পরিচয় জানার দিন।

আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীর বয়স আর ভারতীয় মুনিঋষিগণের উপলব্ধি ও তপস্যা প্রসূত সিদ্ধান্তে পৃথিবীর বয়সের তফাৎ খুব বেশী নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কালগণনাকে শতাব্দ, সহস্রাব্দ ইত্যাদি এককে সীমাবদ্ধ রেখেছেন ভারত সেখানে যুগ, মহাযুগ, মন্বন্তর, কল্প ইত্যাদি এককে বিবৃত করেছে। এই সববিষয়ে সুষ্ঠ, সুসম্বদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত হওয়া শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

## বিশেষজ্ঞদের মতে

# হিন্দু ক্যালেণ্ডার তুলনামূলক ভাবে সঠিক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ হিন্দুদের কাছে হোলি এমন একটি উৎসব যা সাধারণ মানুষকে পারস্পরিক মেলবন্ধনে উজ্জীবিত করে। সাধারণত বসন্তকালে এই উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এই উৎসব দিনপঞ্জী বা ক্যালেন্ডারে দোল উৎসবের তিথিকে নিশ্চিত করে। জ্যোর্তিবিদরা বলছেন হিন্দু দিনপঞ্জী ইংরাজী ক্যালেন্ডারের তুলনায় অনেক বেশী সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ ইংরেজী ক্যালেন্ডারে নির্দিষ্ট ঋতু বা উৎসবগুলিকে সঠিক ভাবে বর্ণনা করা হয়নি। জ্যোর্তিবিদদের মতে হিন্দু ক্যালেন্ডার বা বিক্রম সংবত দিনপঞ্জীর মধ্যে ঋতু এবং উৎসবের সময়কাল প্রায় একই। বার্ষিক আবহাওয়া চক্র চন্দ্র এবং সূর্যের গতিপথকে পর্যবেক্ষণ করেই স্থির হয়।

| चैत्र शुक्ल पक्ष संवत् २०६७ | | | | मार्च २०१० | |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि | | | | २१ पञ्चमी/षष्ठी | २८ त्रयोदशी |
| सोम | | | | २२ सप्तमी | २९ चतुर्दशी |
| मंगल | | | १६ चैत्र शुक्ल १ (नवसंवत्सर) | २३ अष्टमी | ३० [illegible] |
| बुध | | | १७ द्वितीया | २४ नवमी | ३१ द्वितीय [illegible] |
| गुरु | | | १८ तृतीया | २५ दशमी | |
| शुक्र | | | १९ चतुर्थी | २६ एकादशी | |
| शनि | | | २० पञ्चमी | २७ द्वादशी | |
| वैशाख कृष्ण पक्ष/शुक्लपक्ष/ज्ये.कृ. संवत् २०६७ मई २०१० | | | | | |

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় ক্যালেন্ডার সাধারণত গঠিত হয় সূর্য, চন্দ্র এবং তাদের গাণিতিক গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন সৌরবৎসরকে বিভক্ত করা হয় ১২টি চন্দ্রমাস দিয়ে। মাস হয় সাধারণত ২৯ দিন, ১২ ঘণ্টা, ৪৪ মিনিট এবং ৩ সেকেন্ডের। বছরের ১২টি মাসকে সাধারণত চন্দ্র বৎসর বলা হয়। ৩৪৫ দিন ৮ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট এবং ৩৬ সেকেন্ড সময়কালে হয় এক চন্দ্র বৎসর। অন্যদিকে ইংরাজী ক্যালেন্ডার গঠিত হয় সূর্যের গতিপথ কেন্দ্র করে। পৃথিবী তার নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় প্রায় এক বৎসর অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড। সূর্যের এই গতিপ্রকৃতিকে কেন্দ্র করে ইংরাজী ক্যালেন্ডার গঠিত হয়। বিবিধ কারণবশত হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হোলি এ বৎসর দশ দিন এগিয়ে এসেছে। আগের বৎসর হোলি উৎসব পালন করা হয়েছিল ১১ই মার্চে। এ বৎসর তা হয় ১লা মার্চে। সাধারণত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের গতিপথ অনুযায়ী আমাদের হিন্দু ক্যালেন্ডার রচিত হয়। জ্যোর্তিবিদ এবং আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা ভারতভূষণ পদ্মাদেওর মতে হিন্দু বা ভারতীয় ক্যালেন্ডার হলো প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিনপঞ্জী। হিন্দু ক্যালেন্ডারে ছয়টি ঋতুর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আবহাওয়া অনুযায়ী ঋতুগুলির নাম ঠিক করা হয়। পদ্মাদেওর মতে ভারতীয় ক্যালেন্ডারে রাশি বিষয়ক আলোচনাও করা হয়েছে। আর এক জ্যোর্তিবিদ বিজয় পাঠকের মতে হিন্দু ক্যালেন্ডার অনেক বেশি নির্ভুল। ইংরাজী ক্যালেন্ডারের তুলনায়। বিজয় পাঠকের মতে বার্ষিক আবহাওয়া চক্র অনুযায়ী হিন্দু ক্যালেন্ডারের ছয়টি ঋতুর বর্ণনা আছে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এবং বসন্ত। অন্যদিকে ইংরাজী ক্যালেন্ডারে তিনিটি ঋতুর বর্ণনা আছে। ফলে হিন্দু ক্যালেন্ডার সব দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। বিশিষ্ট জ্যোর্তিবিদগণ এরকম অভিমতই পোষণ করেন।

অঙ্গনা

# ফুলের নেশা ও পেশায় সুস্মিতা দত্ত

**ইন্দিরা রায়**

প্রতি শীতের মরশুমে ফুলের সৌন্দর্য দেখতে পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। বিধানসভা আয়োজিত পুষ্পপ্রদর্শনী দেখতে গিয়ে নানারঙের নানারকমের আলো করা ফুল দেখার পাশাপাশি ছোট ছোট প্যাভিলিয়নে ফুলসজ্জা বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়ল। সেখানে অনেকগুলি ফুলের সাজ আছে একেক কবির মনের ভাব প্রকাশ অনুযায়ী। দৃষ্টিনন্দন পুষ্পপ্রদর্শনীর শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল গেটের কাছে। তিনি হলেন এ সময়কার একজন ফ্লোরেল আর্টিস্ট সুস্মিতা দত্ত। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এল অনেক কথা, তাঁর এ পথে আসা ও পেশার কথা।

খুব ছোটবেলা থেকেই নতুন কিছু সৃষ্টি করার মানসিকতা ছিল সুস্মিতার। ফুল কে না ভালবাসে! যারা শিল্পরসিক তাঁদের কাছে ফুল পরম প্রিয়। যৌবনের প্রান্তে যখন, তখন এক কাকিমা তাঁকে নিয়ে যান 'পুষ্পবিতান' নামে একটি ক্লাবে। সেখানে ফুল সাজানোর ব্যাপারটা ছিল বৈশিষ্ট্য। সেই দেখে সুস্মিতা দত্ত-র ভীষণ ভাল লাগে। তারপরে কেমন করে এ পথে আসা, শোনা যাক শিল্পীর নিজের কথায়। 'তখন সবে গ্রাজুয়েশন করেছি, বিয়েও হয়েছে। কাকিমা নিয়ে গেলেন 'পুষ্পবিতান ক্লাবে। গিয়ে দেখি, ওখানকার সদস্যরা খুব সুন্দর করে ফুল সাজাচ্ছেন। আমার খুব ভাল লাগল। স্বনামখ্যাত ফ্লোরেল শিল্পী উমা বসু ওখানে প্রায়ই আসতেন। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে ওনার আলাপ হল। ওনার কাছে ফুল সাজানো শিখতে শুরু করি। দীর্ঘ বছর ওনার কাছে ফুল সাজানো শিখি। সার্টিফিকেটও পাই। আমার ফুল সাজানোর ব্যাপারে যে কৌতুহল ছিল, তাও একে একে জেনে নিই। এভাবেই ধীরে ধীরে এ পথে আসা। তবে হ্যাঁ, কোনদিনও ফুলকে পেশা করে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হব ভাবতে পারিনি।'

ফুলের সাজে একটা কথা খুব শোনা যায়, 'ইকাবোনা'। যে ভাবেই ফুলকে সাজানো হোক না কেন, সকলেই বলে 'ইকাবোনা'। আপনার কাছ থেকে জানতে চাই;ইকাবোনা-র প্রকৃত কনসেপশনটা কি?

'হ্যাঁ সাধারণের মনে এই একটা ভুল ধারণা আছে। 'ইকাবোনা' হলো একটা জাপানি পদ্ধতি, কিন্তু ভারতীয় ভাবধারার রীতিও আছে। দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। ভারতীয় ভাবধারায় ফুল সাজানো মানে একটা থিম বা বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করা। ইকাবোনা রীতি জাপানি প্রথা। এতে মূল ব্যাপার হল লাইন অ্যাণ্ড অ্যাঙ্গল। এই সাজানোয় ফুল খুব কম লাগে। মেজারমেন্টের ব্যাপারটা খুব জরুরি এ ক্ষেত্রে। ফুল রাখার ফুলদানিটা চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। আমি দুটো পদ্ধতিই শিখেছি উমা বসুর কাছে।'

ফুলকে ভালবেসে কোনওদিন এই নিয়ে কাজ করবেন ভাবেননি সুস্মিতা দত্ত। ওনার নিজস্ব কোনও বুটিক বা ক্লাস নেই। তবে বাড়ি গিয়ে ফুল সাজানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্রীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার আমন্ত্রণ আসে। এ ছাড়া, এমন অনেকে আছেন, যাদের ভাবনা আছে, কিন্তু দক্ষতা নেই, তাদের আমন্ত্রণে ফুল সাজিয়ে থাকেন। সেইসঙ্গে, বিয়েবাড়ি, পুজোবাড়ি, জন্মদিন, হোটেলের কনফারেন্স রুম, পার্টিতে তাঁর ডাক পড়ে। প্রতিবছর পুষ্পপ্রদর্শনীতে ফুল সাজিয়ে উপস্থিত থাকেন।

*পুষ্পবনে পুষ্প আছে, আছেন সুস্মিতাও।*

শোভাবাজার অঞ্চলের পুরনো পাড়ায় পুরনো বাড়িতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফুল সাজিয়ে রেখে ঘরের এক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলেন। আসলে সব সময়ই মাথায় নানান চিন্তা আসে। বিভিন্ন বিষয় ভাবনা দিয়ে ফুল সাজান। ইতিমধ্যে রামায়ণ, সন্ত্রাস, বাসন্তিকা, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ফুল সাজিয়েছেন। ইদানিংকালে বিভিন্ন কবির কবিতার ভাবকে ফুটিয়ে তুলছেন ফুলের সাজে। এ ক্ষেত্রে যে যত নতুনত্ব আনবে, সেটাই হবে তার কৃতিত্ব।

ফুলকে পেশা করে স্বমহিমায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা এ ব্যাপারে এখনকার মেয়েদের কাছে পরামর্শ কি, এ ব্যাপারে জানালেন—দেখুন সবাইকে যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। সম্পূর্ণ অন্যরকম পেশায় থেকে নিজে আনন্দ পাওয়া যায়। এর জন্য অবশ্যই কোর্স করতে হবে, খোঁজ রাখতে হবে। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আছে, এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে শিখিয়ে থাকেন। উমা বসুর খোঁজ করা যেতে পারে। এ পেশায় আনন্দ আছে, স্বাধীনতা আছে।

ইতিমধ্যে বহু পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটেছে। এগ্রি হর্টিকালচার, হাইকোর্ট, বিধানসভার পুষ্পপ্রদর্শনী, কলকাতা কর্পোরেশন-এর পুষ্পপ্রদর্শনী, ইডেন গার্ডেন্সেও আমন্ত্রিত হয়েছেন সুস্মিতা। হাইকোর্ট থেকে চ্যালেঞ্জ ট্রফি লাভ করেছেন ৯৫/৯৬-এ। প্রথমস্থান প্রতি বছরই। এ সব জায়গায় আমন্ত্রণে নিজের সম্মান বাড়ে।

সব সিজনে তো ফুল ভাল পাওয়া যায়না, সেক্ষেত্রে কি ইমিটেশন ফুলের ব্যবহার চলে—হ্যাঁ, চলে তবে বুঝে শুনে। অনেকসময়ে নকল পাতা বা ডাল সাজানো যায়। তবে তা সাজানোর ওপর নির্ভর করে।

বাড়ি থেকে বাধা বা আপত্তি নেই। তাই সংসারের সব কাজ সামলে স্বাধীনভাবেই কাজ করেন। স্বামী সন্তান সকলেরই সাহচর্য পান। কেউ যদি ফুল সাজানোর ব্যাপারে যোগাযোগ করেন, নিচের দূরভাষে যোগাযোগ করতে পারেন। দূরভাষ : ৯৮৩১৮২৮১৭৬

## ।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।। ৩

*কাশীতে অহংকারী পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে হারিয়ে নিমাই নবদ্বীপে ফিরলেন।*

*কলাপাতা বিক্রেতা ভগবদভক্ত শ্রীধরকে রাগিয়ে দিয়ে নিমাই খুব মজা করতেন।*

*সেইসময় একদিন নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরী এলেন। নিমাই তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলেন।*

*'গীতা প্রেস' গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)*

## কিষাণ সঙ্ঘের প্রতিনিধি সম্মেলন

বিগত ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি তামিলনাড়ুর তিরুচেরাপল্লীতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের চৌত্রিশটি প্রান্ত থেকে মোট ২৯৩ জন প্রতিনিধি ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক মহিলা প্রতিনিধিসহ মোট ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা আলাদাভাবে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ওই সভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের আলুচাষীরা যাতে আলুর দাম ন্যায্য হারে পেতে পারেন সেই ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হবে। উক্ত আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা মোহিনীমোহন মিশ্র।

## মুরালভাইয়ের আবেদন

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে আগত তীর্থযাত্রী তথা পুণ্যার্থীদের প্রতি দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠ আশ্রমের সম্পাদক তথা ট্রাস্টী ব্রহ্মচারী মুরালভাই এক আবেদনে জানান সকলে যেন গঙ্গা দূষণ এবং বিশ্ব উষ্ণায়ণের ব্যাপারে সচেতনতার সঙ্গে এক সদর্থক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অনুরোধ— প্রত্যেক পুণ্যার্থী পুণ্যস্নানের পর বাড়ি গিয়ে একটা করে ভারতীয় গাছ স্বহস্তে যেন রোপন করেন।

এবারের পূর্ণকুম্ভ মেলায় আদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য নিঃখরচায় চিকিৎসা এবং অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মুরালভাই জানান। তিনি আরও জানান যে গাড়োয়াল হিমালয়ে বসবাসকারী দরিদ্র আর্ত মানুষের সেবায় সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আগামীদিনে ঋষিকেশ আধ্যাত্মভাব প্রচার এবং সেবাকাজের জন্য শাখা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই সমস্ত কিছুই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী অন্নদা ঠাকুরের ইচ্ছানুসারেই করা হচ্ছে বলে মুরালভাই জানান।

## দমদমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি দমদম নাগেরবাজারে, শিল্পী ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের পরিচালনায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাগেশ্রী ও পুরিয়া কল্যাণ রাগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবীণ শিল্পী বিশ্বনাথ সুর। সাথে তবলা, হারমোনিয়াম ও তানপুরা বাজান যথাক্রমে মনোজ পান্ডে, বলরাম ঘোষ এবং তৃপ্তি দাস। পূরবী ও ভৈরবী ধুন রাগে গীটার বাজান রামমোহন ভট্টাচার্য।

সমাবেশ সমাচার

সাথে তবলা বাজান ভবতোষ বিশ্বাস। জয়জয়ন্তী রাগে বাঁশী বাজিয়ে আনন্দ দান করেন অশোক কর্মকার।

শেষে শিল্পী বাঁশীতে রামকৃষ্ণের গান বাজিয়ে শোনান।

## শোক সংবাদ

সোদপুর নিবাসী স্বয়ংসেবক কানাই ভট্টাচার্যের পিতৃদেব শিশিরকমল ভট্টাচার্য গত ৬ মার্চ ভোরে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। স্ত্রীসহ চার পুত্রকে রেখে গেলেন তিনি।

# ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঞ্জীবনী সাভারকর

*(২ পাতার পর)*

বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে গ্রন্থটির আবরণ উন্মোচন করেন আচার্য ধর্মেন্দ্রজী মহারাজ। সাভারকরকে অখণ্ড ভারতের পূজারী বলে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর মহিমাকে আড়াল করা যাবে না, সূর্যের মতোই তিনি প্রকাশিত হবেন। জাতিকে তিনি প্রতিবাদ ও প্রতিকারের ভাষা শিখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শাসক কংগ্রেস দলের গান্ধী-নেহরু প্রীতির ও সাভারকরের প্রতি উপেক্ষার ভাবকে কঠোর সমালোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানেই জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘ প্রকাশিত 'বীর সাভারকর, নেতাজী সুভাষ ও ডাঃ হেডগেওয়ার' শীর্ষক স্মারক গ্রন্থটির উন্মোচন করেন ডঃ শ্রীবাস্তব। তিনি গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করে উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান।

এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ কলকাতা শাখার দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে। স্বাগত ভাষণ দেন যুগলকিশোর জৈথলিয়া। কবি লাজপত রায় স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বীর সাভারকরের প্রতিকৃতিতে মঞ্চস্থ সকলে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। তিনি বলেন, ভারতের শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করাই ছিল বীর সাভারকরের লক্ষ্য। ভারত রাষ্ট্র (জাতি) সৃষ্ট নয়, জন্মগত অধিকার।

পুরো তিন ঘণ্টার এই অনুষ্ঠান চললেও শ্রোতাদের ধৈর্য ক্ষুন্ন হয়নি। সভার শেষ লগ্নে সকলকে ধন্যবাদ জানান কুমারসভার সভাপতি ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী।

# বাঙালী ক্রিকেটারেরা আর কবে স্বীকৃতি পাবেন ?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। ২০০৫-০৬, ২০০৬-২০০৭ পরপর দু'দুবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলা, গত দু'বছর বিজয় হাজারে একদিনের ক্রিকেটেও শেষ ল্যাপে পৌঁছনোর পরও বাংলার ক্রিকেটাররা জাতীয় দলে ব্রাত্য হয়েই থাকেন। আর বছরের পর বছর, ম্যাচের পর ম্যাচ জাতীয় দলে টিকে থাকে রোহিত শর্মা, সুরেশ রায়না, বদ্রীনাথরা। এরা কালেভদ্রে বলার মতো ইনিংস খেলেন, যদিও সেসব ইনিংস দেশের কোনও কাজে আসে না। ভারতকে জেতার জন্য নির্ভর করতে হয় সেই বৃদ্ধ তেন্ডুলকর বা সহবাগ, ধোনী, যুবরাজদের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ওপর।

'ক্যাচ দেম ইয়ং' শুনতে খুব ভাল লাগে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জাতীয় দলের নির্বাচকরা বেশ কিছু তরুণ ক্রিকেটারকে এক বছরে খেলিয়েছেন বা এখনও খেলিয়ে যাচ্ছেন। ক'জন টিমের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দিতে পেরেছে? তাহলে কেন বাংলার লক্ষীরতন শুক্লা, রণদেব বসু, মনোজ তেওয়ারিরা সুযোগ পাবেন না? এক-আধটা ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক বা নামমাত্র টেস্ট খেলিয়ে তাদের চিরতরে ভুলে যাওয়া হবে। এই প্রহসন আর ক'দিন সহ্য করবে সি এ বি? সেই গত শতাব্দীর তিনের দশক থেকে এই ট্রাডিশান চলছে। তখনও বাংলা ফাইনালে

উঠত আর নির্মল চ্যাটার্জি, কার্ত্তিক বসু, সুঁটে ব্যানার্জিরা টেস্ট স্কোয়াডের বন্ধ দরজাটা খুলে ইন্ডিয়া ক্যাপ পড়ে সবুজ গালিচায় পা রাখার সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চি ত হতেন।

পরবর্তীকালে এক পঙ্কজ রায় আর কিছুটা প্রবীর সেন কয়েকবছর টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর দাড়ু ফাড়কর অলরাউন্ডার হিসেবে দেশকে টেনে গেছেন অনেকদিন ধরে। তবে তিনি বাজে ক্রিকেটার নন, এসেছিলেন মহারাষ্ট্র থেকে, একেবারে তৈরি হয়েই। এদের পরের যুগে উঠে এসেছিলেন শ্যামসুন্দর মিত্র, বাংলার চিরশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। হ্যাঁ; নির্মল চ্যাটার্জি, পঙ্কজ রায়, সৌরভ গাঙ্গুলি, অম্বর রায়, অরুণলাল সবার কথা মনে রেখেই নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া উচিত এই উক্তির সারবত্তা। শ্যামসুন্দরকে রঞ্জি, দলীপ ট্রফির ম্যাচে আউট করতে হিমসিম খেতে হোত তৎকালীন দেশের সব বোলারকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভয়ঙ্কর বোলার গিলক্রিস্ট ও পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন শ্যামসুন্দর তাকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে খেলেছেন।

অম্বর রায় আর এক প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান। ক্লাসিক্যাল বাঁ হাতি মাত্র ৪টে টেস্ট খেলেছেন। অথচ সমসাময়িক হনুমন্ত সিং, আববাস আলি বেগ, রুসি সূতিরা অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ পেয়েও বলার মতো কিছু করে দেখাতে পারেননি। হনুমন্তও অবশ্য অম্বরের মতই প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন,তবে সুবিচার করতে পারেন নি। অজিত ওয়াদেকার তখন ভারতীয় দলে অন্যতম বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান। যদিও অম্বরের খানিকটা পরেই ভারতীয় ক্রিকেটে এসেছেন। লেখাপড়ার জন্য একটু বেশি বয়সেই ক্রিকেট শুরু করেছিলেন। কিন্তু তুল্যমূল্য বিচারে অম্বরই এগিয়ে থাকবেন। তবে অম্বর ছিলেন আপাদমস্তক সুখী ক্রিকেটার। সর্বশেষে আলস্য ভারতীয় ক্রিকেট নির্বাচকদের কাছে তার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছিল।

সুইং বোলার সুব্রত গুহও অম্বরের মতো চারটে টেস্ট খেলে হারিয়ে গেছেন। তার সময়ে দেশের সেরা সীম-সুইং বোলার ছিলেন সুব্রত। দেশের সব সেরা ব্যাটসম্যান তার বলের সামনে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করতেন। গ্যারি সোবার্স, কানহাই, ব্যারিংটন, ইয়ান চ্যাপেলের মতো টেস্টের সেরা ব্যাটসম্যানরাও তার সুইংকে যথেষ্ট সমীহ করতেন। সুব্রতর জুড়ি সমর চক্রবর্তী অসাধারণ এক বোলার ছিলেন যিনি বাতাসের সাহায্য না নিয়েও দু'দিকের বল কাট করাতে পারতেন। সুব্রত-সমীর চক্রবর্তী জুটি তিনবার বাংলাকে রঞ্জি ফাইনালে তুলেছেন কিন্তু যথাযথ স্বীকৃতি পাননি। একই কথা প্রযোজ্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান গোপাল বসু, উইকেটকিপার সম্বরণ ব্যানার্জি ও পেস বোলার বরুন বর্মন সম্পর্কে। নিজ বিভাগে এরা প্রত্যেকেই দেশের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হয়েও টেস্টক্যাপ পাননি।

অবস্থার খানিকটা বদল করতে পেরেছিলেন বাঁহাতি স্পিনার দিলীপ দোশি। বিষেণ সিং বেদীর অবসরের পর ওই স্পিন বিভাগটা চালু রাখতে দোশিকে দলে ঢোকাতে বাধ্য হন নির্বাচকরা। তবে তাকে দলে ঢোকাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক তথা ভারতীয় ক্রিকেটের শেষ কথা সুনীল গাভাস্কার। জোশি অবশ্য চলনসই পারফরমেন্স করে গেছেন, যা সুযোগ পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করে। পরে ওই গাভাস্কারই তাকে ছেঁটে ফেলেন প্রিয়পাত্র রবি শাস্ত্রীর জায়গা পাকা করতে। আর এক সময়ের সুনীল শিষ্য শাস্ত্রী পরবর্তীকালে সুনীলকে ভুলে শচীন তেন্ডুলকর বন্দনায় মেতে ওঠেন। নিতান্তই

*দীপ দাশগুপ্ত*

সাধারণমানের ক্রিকেটার শাস্ত্রী যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ পেয়ে গেছেন, গুটিকয়েক ভাল ইনিংস ও মন্দের ভাল চলনসই বোলিং স্পেল করে।

আটের দশকে অরুণলাল কয়েকটি টেস্ট খেলেছেন। অরুণলাল অবশ্য দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচিত মুখ হিসেবেই। মাঝারি মানের ব্যাটসম্যান হলেও ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা ও অদম্য মনোবল তাকে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ সফল ব্যাটসম্যান হলেও টেস্টে দাগ কাটার মতো তেমন ইনিংস খেলতে পারেননি। কয়েকটি অর্ধশতরানের ইনিংস তার টেস্ট

*রণদেব বসু*

জীবন দীর্ঘায়িত হতে দেয়নি। নভজ্যোত সিং সিধু এসে তার জায়গা নেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে খেলে গেছেন জাতীয় দলে।

তবে অরুণের সমসাময়িক আর এক উত্তুরে ক্রিকেটার অশোক মালহোত্রা বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে এরাজ্যেই থেকে গেছেন। তিনি অবশ্য কর্মের সন্ধানে বাংলায় এসেছিলেন এবং তা টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবেই। রঞ্জি, দলীপ ট্রফিতে বাংলা ও পূর্বাঞ্চ লের হয়ে বড় ইনিংস খেলার পরও টেস্ট টিমে ফিরতে ব্যর্থ তিনি।

এদের অধিনায়কত্বে ক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠেন সৌরভ গাঙ্গুলি। আর পিছনে ছিলেন জগমোহন ডালমিয়ার মতো ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বময় কর্তা। ডালমিয়ার স্নেহধন্য ও পূর্বাঞ্চ লের নির্বাচক সম্বরণ ব্যানার্জির কূটনৈতিক যুক্তিজাল অবশিষ্ট ভারতের নির্বাচকদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে সৌরভকে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দেয় জাতীয় দলে। দীর্ঘদিন অবশ্য সুনাম ও দাপটের সঙ্গেই খেলেছেন দেশে-বিদেশে। ক্রিকেটার সৌরভকে ছাপিয়ে গেছেন অধিনায়ক সৌরভ। তাঁর নেতৃত্বেই ভারতীয় দল চরিত্র ও মানসিকতায় আধুনিক হয়ে ওঠে এবং বিদেশে জেতার মতো দুর্লভ ও অবাস্তব ঘটনাকে বাস্তব করে তোলে। আজ ভারতীয় ক্রিকেটের যা পরিণতি তার সফল রূপকার সৌরভ। তবে সৌরভ অধিনায়ক হয়ে যে পরিমাণ দাপট ও সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন তাতে তার কাছে বাংলার ক্রিকেটের অনেক বেশি প্রত্যাশা ছিল। তিনি ইচ্ছে করলেই উৎপল চ্যাটার্জিকে তার ক্রিকেট জীবনের শেষপর্বে গুটিকয়েক টেস্ট ও আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলিয়ে দিতে পারতেন।

বাংলার ক্রিকেটে সবচেয়ে দুর্ভাগা ক্রিকেটারের নাম উৎপল চ্যাটার্জি। বাংলার চিরশ্রেষ্ঠ চৌখস ক্রিকেটার, বছরের পর বছর বহু ম্যাচ উতরে দিয়েছেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তার মতো জ্বলে উঠতে ক'জন পেরেছেন? অথচ ভাগ্যে তিনটে ওয়ান-ডের বেশি জোটেনি। উৎপলের ব্যাপারে সৌরভের কিছুটা হলেও জড়তা ছিল। তার জন্য গলা না ফাটিয়ে সৌরভ ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারদের তুলে আনতেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। আর বাংলা তথা পূর্বাঞ্চ লের কোনও নির্বাচকই তার জন্য বোর্ডে সদর্থক ভূমিকা পালন করেননি। উৎপলকে দেখে বড় হয়েছেন রণদেব বসু, লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তার লড়াকু মনোভাব, সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেকে

*লক্ষ্মীরতন শুক্ল*

মেলে ধরার ক্ষিদে অনুপ্রাণিত করেছে পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের। দেবাং গান্ধী, রণদেব, লক্ষ্মী বহুবার একথা স্বীকারও করেছেন। উৎপলের মতোই এরা বহু ম্যাচ বাংলাকে জিতিয়েছেন। সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বাংলাকে সম্মানজনক জায়গায় তুলে নিয়ে এসেছেন। আর উৎপলের মতোই এরা চিরবঞ্চি ত। গত পাঁচ বছরে বাংলা যত ম্যাচ জিতেছে, গত ৬০/৭০ বছরে তার তুল্য পারফরমেন্স কোথায়? এসব দেখে-শুনেও অন্ধ সেজে বসে আছেন বোর্ড কর্তা ও নির্বাচককূল।

*উৎপল চ্যাটার্জী*

## শব্দরূপ - ৫৪০

**অনুসূয়া ভাদুড়ি**

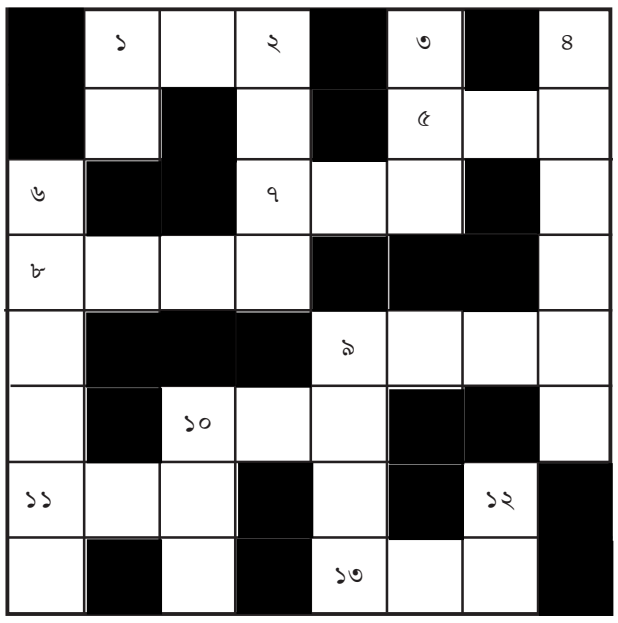


**সূত্র ঃ**

**পাশাপাশি ঃ** ১. প্রতিশব্দে স্তব, স্তুতি, ৫. তৎসম শব্দে মাদুলি, তাবিজ, ৭. বিশেষণে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত, ৮. '—পিঠের পরে লোটে' শূন্যস্থানে খোলা চুল, ৯. কোমর, ১০. লেখনী, ১১. ইঙ্গ শব্দে তরল পদার্থের ওজনের মাপবিশেষ, ১৩. কপিলাবস্তুর ঐতিহাসিক এক উদ্যান যেখানে বুদ্ধ দেব জন্মগ্রহণ করেন।

**উপর-নীচ ঃ** ১. সুবিখ্যাত দৈত্যরাজ, পূজাযজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে বধ, ২. ফণীমনসার গাছ, প্রথম দুয়ে সাপ, ৩. গঙ্গাদেবীর বাহন, রাশি বিশেষ, শেষ দুয়ে খাজনা, ৪. পূজান্তে দেবী দুর্গার প্রস্থান, একে-পাঁচে কুড়ি, দুয়ে-তিনে পার্বতী, ৬. মানুষের মাথার মালা শোভিতা তাই কালিকা দেবী এই নামে ভূষিতা, চারে জননী, ৯. সন্ন্যাসীর জলপাত্র বিশেষ, ১০. হস্তি বা উষ্ট্রশাবক, ১২. সম্মানীয়, গর্বী, মান্য।

**সমাধান শব্দরূপ - ৫৩৮**

**সঠিক উত্তরদাতা**

**শান্তনু গুড়িয়া**
**বাগনান, হাওড়া-৩**
**শৌনক রায়চৌধুরী**
**কলকাতা-৭০০০০৯**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভৈ | ■ | ■ | অ | নু | সূ | য়া | ■ |
| র | ■ | ■ | ঞ্জ | ■ | চ | ■ | ■ |
| ব | সু | ম | না | ■ | না | র | দ |
| ■ | ম | ■ | ■ | ■ | ■ | বি | ■ |
| ■ | ঙ্গ | ■ | ■ | ■ | ■ | ক | ■ |
| ক | ল | হ | ■ | স | ম | র | স |
| ■ | ■ | র্য | ■ | র | ■ | ■ | ঞ্জ |
| ■ | অ | শ্ব | থ | মা | ■ | ■ | য় |

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

● ৫৪০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ মার্চ, ২০১০ সংখ্যায়

ফিরে দেখা ঃ জ্যোতি বসু

# মানব-দরদী এক দেশপ্রেমিকের কাহিনী (পর্ব - ২)

বিশাখা বিশ্বাস

নিন্দা প্রশংসার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয় মৃত্যু। কিন্তু সে কেমন জীবন যা মৃত্যু শেষে পায় কেবলই অপ্রাপ্য আনত প্রণতি, তা কী তার জীবনটিকেও করে না খন্ডিত-ক্ষুদ্র-ক্ষীণ? জীর্ণভিত্তি তাঁর জীবনের অন্তঃপুরে দীপজ্বালা লাল ভ্রূকুটীর নীচে কুব্জপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে কারা ঐ আভূমি আনত শিরে?

মার্ক্সবাদী আঙিনাখানায় ধীরে সন্ধ্যা নামছে। নিরাশ্বাস হচ্ছে দ্বিপ্রহরের পাতা ঝরানো উদ্দাম বাতাস। বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায় কর্মীকুল ক্লেদাক্ত স্বেদাক্ত জীবনের দায় বয়ে চলছে। জীবনের উচ্ছ্বাসকে বিকট উল্লাসে ভ্রূকুটি হেনে তাই তারা আজ চলেছেন অস্ত্র নিয়ে বোমা নিয়ে সুপ্ত হতে লুপ্ত হতে গুপ্ত গৃহ-বাসে। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। আজ রাত্রির আকাশ যে আদর্শ তুলে ধরেছে রাজ্যের ওপর, সে আদর্শ তো নয় কোনও প্রভাতের সূর্যোদয়ের—সে আদর্শ তো ছিল কেবল আত্মধ্বংসের।...

মুখ্যত তারই সুপারিশে ঘটলো ফ্ল্যাট কেলেংকারি। বামফ্রন্টের প্রথম বদ-আচার। দুর্নীতির বদহজমে দুর্নীতিই বাড়ে, অতএব, সাথে সাথে এলো মাটি কেলেংকারির ইতিহাস। স্বয়ং নিজে দুরাচারী যে, অন্যের দুর্নীতিকে রোধ করতে অক্ষম সে। তাই প্রয়াত প্রশান্তশূর অমর রহে, কিন্তু মাটি কেলেংকারি, গ্যাসটারবাইন ক্রয় কেলেংকারি, জমি বিলি কেলেংকারি, মাদ্রাসার সম্পত্তি বেহাতিকরণ কেলেংকারি, আলু কেলেংকারি, সর্বশেষে কোটি কোটি টাকার আলিপুর ট্রেজারি কেলেংকারির একটি প্রকৃত অপরাধীরও শাস্তি দেবার সামর্থ্য ছিল না যার, সুদৃশ্য ও শক্ত আচ্ছাদনে ঢাকা ওইসব কেলেংকারিগুলির আবরণ উন্মোচন করার দায়ে তিনিই অভিযুক্ত করলেন চারখানা সংবাদপত্রকে—আনন্দ বাজার, বর্তমান, টেলিগ্রাফ, স্টেটসম্যানকে। মাসের পর মাস স্টেট্‌স্‌ম্যান এবং আনন্দবাজারের প্রকাশনা বন্ধ রাখতে হল, একমাত্র গণশক্তি ও আজকাল পত্রিকা দুখানি ছাড়া সমস্ত সংবাদপত্রকেই তিনি বল্লেন 'চক্রী সংবাদপত্র'। শহরে-মফঃস্বলে গ্রামে-গঞ্জে তারই বক্তৃতার রেশ ধরে চালু হলো উপহাস "এইসব কেলেংকারির খবর জন্ম নিচ্ছে কোথায়, না, স্টেটসম্যান টেলিগ্রাফ আনন্দবাজার আর বর্তমানের গুপ্তগুহায়।" শুরু হলো সেই পরিহাস ঃ রিগিং জালিয়াতি কারচুপির খবর আসছে কোথা থেকে, না, বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির লুপ্ত গৃহ থেকে। বিধাতার কী বিধান, হাইটেক রিগিংয়ের বিরুদ্ধে অমর যোদ্ধা 'বর্তমানে'র বরুণ সেনগুপ্ত আজ চিতাভস্মতলে অন্তিম শয়ান, কেবল সেই হাইটেক রিগিংয়েরই অভিযোগ নিয়ে ভোটে হেরেই প্রকাশ কারাত-সীতারাম ইয়েচুরিরা আজ আদবানীর হাত ধরে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান!

এরই নাম ইতিহাসের মার—রাজার পাপে রাজ্যনাশ, সেই পাপেই মজেছিল 'কনক লংকা', মজেছিলেন স্বয়ং রাজা 'আপনি'।...

এভাবে সংবাদপত্রের চরিত্রহননের পরই জাতীয়তাবাদী নেতা-নেত্রীর মর্যাদানাশে শুরু হলো তার অভিযাত্রা। নেতাজী সুভাষকে ইনি (এবং এরা) বহুদিন আগেই কুইসলিং, জাপানী কুত্তা, হিটলারের বেড়াল, রিবেনসনের বামন, বার্মার পতিতাপল্লীর সুন্দরী নারীদের 'নাগর' বানিয়েছিলেন, গান্ধীজী বহুকাল আগেই হয়ে গেছিলেন 'বৃটিশের পেট বার্ড' রবীন্দ্রনাথ 'কাচা বাঁশের বংশীবাদক' এক বুর্জোয়া কবি, এমনকী নজরুলকেও এরা বানিয়েছিল 'আধ্যাত্মবাদের বন্দী'।' নতুন আক্রমণে তিনি ইন্দিরাজীকে বানালেন 'ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হ্যাঁয়'। রাজীব সম্পর্কে বল্লেন 'বর্বর'। সিদ্ধার্থকে বানালেন 'জহ্লাদ'। রাজেশ পাইলটকে বল্লেন রং-য়ের 'পালিশ ওয়ালা'। এমনকী বিধবা রাজীব ঘরনীকেও বল্লেন 'চেহারা দেখিয়ে এবারে ভোট ভিক্ষায় নেমেছে এক ঘরের বৌ'। পাশাপাশি নানান সুযোগে-সুবিধায় পোষ মানিয়ে রাজ্যকংগ্রেসের নেতৃবর্গকে বানালেন 'তরমুজ'—প্রণব-প্রদীপ, মানস-সুব্রত প্রমুখ নানান কিসিমের অধমর্ণরাই সেদিন সেই উত্তমর্ণকে করলেন শক্তিশালী।...

তারপর তিনি আঘাত হানলেন রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর। স্বাধীনতাপূর্বকালের সংস্কৃতিটা স্বাধীনতার পরেই নিঃশেষ হয়ে গেছিল—স্বাধীনতার পরে এর আমলে মার্ক্সীয়-সংস্কৃতির নামে এল সন্ত্রাসী বীভৎসতা, উদ্ধত উলঙ্গ কৃতঘ্নতা, সত্য-শান্তি দয়া-প্রেম সমাজ থেকে হলো অবসিত, অপচয়িত। হিন্দিবলয়ের 'আংরেজী হটাও' আন্দোলনের আদলে পঞ্চম শ্রেণীতক ইনি ইংরেজিকে নির্বাসিত করলেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দাও, কম্পিউটর শিক্ষা বরবাদ করো—তারপর প্রায় কুড়ি বছরবাদে যখন আবার ইংরেজীকে ফিরিয়ে আনা হলো, কম্পিউটরকে বরণ করা হলো তখন তো তিনি কেবল বাক্ বিতরণের বিধাতা হয়ে গেছেন, তারপার্টী প্রস্তুতি নিচ্ছে বাণপ্রস্থের।...

তাই, আজ উন্মাদ শঙ্খের গর্জনে, পাশব বিজয় উল্লাসে, বর্বর রথের ঘর্ঘর মন্ত্রে পথের কল্লোলে বাঁশী বাজছে ঃ সে আসছে! মাথা পেতে যারা এতকাল মেনে নিয়েছে এই দুরাচারী শাসকের শাসন-শাস্ত্রখানা, আজ সন্ধ্যার অন্ধকারেও তাদের দীনহীন আত্মা প্রতিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠে গর্জে গর্জে উঠছে। ভয়ের জাল কেটে, পুঞ্জীভূত জড়ত্বের জঞ্জাল অপসারণ করে, মৃত আদর্শের নিষ্ঠা পরিত্যাগ করে মানুষ জাগছে, জাগাচ্ছে ঃ সে আসছে। কিন্তু—

কিন্তু, কোথায় সেই ভোরের বিহঙ্গকুল? কোথায় যাত্রী, কাণ্ডারী কোথায়, কোথায় যে দিশা—কী তার ঠিকানা?

*(আগামীবারে সমাপ্য)*

Swastika
15 March - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

# শিলচরে আর এস এসের সমাবেশে শ্রীভাগবত
# ‘চীন ভারতের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে’

টাউন ক্লাব মাঠের সভায় ভাষণরত মোহনরাও ভাগবত, বসে ডাঃ চিন্ময় চৌধুরী এবং বিমলনাথ চৌধুরী।

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** ‘‘এদেশে বসবাসকারী সকলেই হিন্দু। এখানকার মুসলমান ও খৃস্টানদের পূর্বপুরুষও হিন্দু; উপাসনা পদ্ধতি যাই হোক না কেন। হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব। এদেশে এখনও শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ হিন্দু। সর্বসাধারণের অন্তরে দেশভক্তি জাগ্রত না হলে দেশ উন্নতি করতে পারবে না, সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করা। বিশ্বকল্যাণের জন্যও তা একান্ত আবশ্যক।’’

উপরের কথাগুলি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। শ্রীভাগবত গত ৭ মার্চ দক্ষিণ অসমে তিন দিনের সফরে এসে শিলচর টাউন ক্লাবের ময়দানে স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের এক সমাবেশে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। টাউন ক্লাব ময়দানে আয়োজিত এই সভায় কয়েক হাজার নাগরিক এবং পাঁচশতাধিক স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গণবেশে উপস্থিত ছিলেন। এখানে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। যে বাংলাদেশ বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে ভারতের সবরকম সহযোগিতায় জন্মলাভ করেছিল, তারাই আজ সেদেশে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদীদের সবরকম আশ্রয়, প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে শ্রীভাগবত অভিযোগ করেন। পাকিস্তান সীমাপার-সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে আর চীন ভারতভূমি দখল করতে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভোটের কারণে অসম, পশ্চিমবঙ্গ সহ সর্বত্র মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কড়া সমালোচনা করেন তিনি। অথচ জম্মু-কাশ্মীরে আগত অনুসূচিত জাতির হিন্দুদের আজ অবধি নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মোহনরাও ভাগবতজী।

তিন দিনের সফরে সরসঙ্ঘচালকজী বেশ কয়েকটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ৫ মার্চ সকালে তিনি কলকাতা থেকে বিমানযোগে শিলচর পৌঁছান। প্রতিটি কার্যক্রমে দক্ষিণ অসম প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমলনাথ চৌধুরী ও অন্যান্য কার্যকর্তারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ৬ মার্চ সন্ধ্যায় শিলচর কল্যাণ আশ্রম সভাগারে তিনি সঙ্ঘ এবং অন্যান্য সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের কার্যকর্তাদের এক বৈঠকে পথনির্দেশ করেন।

শিলচরে স্বয়ংসেবক সমাবেশ, ৭ মার্চ, ২০১০।

# দক্ষিণ অসমে সদ্‌ভাবনা সম্মেলন

শিলচরে সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন ভন্তে পূরণপালজী।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ‘‘হিন্দুত্বই বিশ্বকে শান্তির পথনির্দেশ দিতে পারে। এজন্য হিন্দু সমাজের মধ্যে সকল মত-পন্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌ভাবনা আবশ্যক। সদ্‌ভাবনা ব্যতিরেকে কোনও কাজ সুসম্পন্ন হয় না। বিগত হাজার বছরে সমাজের মধ্যে অনেক ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে। আমরা যে কোনও মত-পন্থের অনুসারী হই না কেন সকলেই একই হিন্দু সনাতন ধর্মের অনুসারী। বিদেশী শক্তি সমাজের বৈচিত্র্যকে বিকৃত করে এবং ভেদাভেদকে উস্কে দিয়ে হিন্দু সমাজকে আঘাত করে চলেছে। হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সমাজের সকলকে এক হতে হবে।’’

উপরোক্ত কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবত। গত ৫ মার্চ, বিকেলে শিলচর কল্যাণ আশ্রম সভাগারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ অসম প্রদেশ আয়োজিত সদভাবনা ও জাত-বিরাদরি সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় শ্রীভাগবত এই মন্তব্য করেন। বিভিন্ন মত-পন্থ-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী কুড়িজন সাধুসন্তসহ প্রায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন শাখা, ইসকন, গড়িয়া মতানুসারী জমাতিয়া সমাজ, ত্রিপুরা ও মিজোরাম থেকে আগত বৌদ্ধ সন্ত ভন্তে পূরণপাল এবং ভন্তে ব্রহ্মজ্যোতি মহারাজ, হাফলং এবং শিলচরের প্রমুখ ডিমাসা জননেতা ও সমাজসেবী ধনিলাল নাইডিং এবং শোণিত কুমার বর্মন, গায়ত্রী পরিবারের পরিব্রাজক বিজয় তেওয়ারি, জিরিঘাট কালীমন্দিরের জিতেন মহারাজ, পতঞ্জলি যোগপীঠের সুকুমার নাথ, মারোয়াড়ী সম্মেলনের বিমল চোরাড়িয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের চন্দ্রকান্ত সিংহ এবং পণ্ডিত উমাকান্ত তেওয়ারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওইদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মিজোরাম থেকে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষু ভন্তে পূরণপালজী মহারাজ।

প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০
নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৭
মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ভাষায় হিন্দুত্ব মানে জীবনধারা। কিন্তু বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতার অক্টোপাশে হিন্দুরা আবদ্ধ। দেশভাগ এবং অনুপ্রবেশের বিড়ম্বনায় হিন্দুরা আজ আশঙ্কিত। বস্তুত বাঙালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ কি? কেমন রয়েছে পদ্মাপাড়ের হিন্দুরা – এসব নিয়েই স্বস্তিকার বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ দশ টাকা।।
২৭ মার্চের মধ্যে এজেন্টরা কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com